ভগবান
বুদ্ধদেব

ভগবান বুদ্ধদেব

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি • কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : বুদ্ধ পূর্ণিমা : ১৩৬৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্ষয় পূর্ণিমা : ১৩৭৪
দাম ৩·০০

চিত্রশিল্পী :
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২ হইতে শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত ও সাধারণ প্রেস ১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক মুদ্রিত

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্ ।
সদয়হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥
জয়দেব
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য
রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

গৌতম বুদ্ধই তাঁহার সমসাময়িক প্রাচীন ধর্মপ্রচারকগণের মধ্যে প্রধান ও একমাত্র তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মই এককালে ভারত হইতে এশিয়ার নানাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম কেবলমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং উপযুক্ত প্রচারের অভাবে ভারতের বাহিরে সে যুগে তাহার বিস্তৃতি ঘটে নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। ভারতে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্মই একদিন অন্যতম ভারতীয় ধর্মরূপেই ভারতে ও ভারতের বাহিরে সম্যক প্রসারতা ও সমাদর লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের মূলে ভারতীয় দর্শনের কৈবল্য বা নির্বাণবাদ নিহিত থাকায় এবং "মা হিংস্যাঃ সর্বভূতানি" বেদের এই উপদেশটি বৌদ্ধধর্মের অহিংসাবাদের ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত হওয়ায় অনেকের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল।

হিন্দুশাস্ত্রে দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনোস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কীচতে দশ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে নারায়ণ যে বুদ্ধরূপে জন্মিবেন তাহার পূর্বাভাষ আছে। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশের অষ্টাদশ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে এবং অগ্নিপুরাণ, বায়ু-পুরাণ প্রভৃতিতে বুদ্ধের বিষয়ে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরকোষের প্রথম অধ্যায়ে—

সর্বজ্ঞো সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিৎ লোকজিৎ জিনঃ ॥

ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্র শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু যঃ॥
স শাক্যসিংহঃ সর্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ॥

ধর্মগুরুরূপে গৌতমবুদ্ধের স্থান যে অত্যুচ্চে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকহিতের যে শুভেচ্ছার মূলে অপূর্ব ত্যাগ, জ্ঞান ও চরিত্রোৎকর্ষ থাকিলে ধর্মগুরুর মহিমা লোকোত্তর ও কালোত্তর হইয়া উঠে, গৌতমবুদ্ধের তাহা ছিল এবং এইজন্যই তাঁহার সম্বন্ধে লোকের ধারণা—

বুদ্ধং জ্ঞানমন্তং হি আকাশবিপুলং সমং।
ক্ষপয়েৎ কল্পভাষন্তং ন চ বুদ্ধগুণক্ষয়ঃ॥

—অনন্ত আকাশের যেমন শেষ নাই, বুদ্ধের গুণেরও তেমনি শেষ নাই। কল্প কাল ধরিয়া কেহ যদি বুদ্ধের গুণের কথা বলেন, তাহা হইলে কল্প কাল শেষ হইয়া যাইবে কিন্তু বুদ্ধের গুণের আর শেষ হইবে না।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন ও খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে মহানির্বাণ লাভ করেন। তাঁহার পিতার নাম শাক্যরাজ শুদ্ধ (পবিত্র) + ধন = শুদ্ধোধন অথবা শুদ্ধ + ওদন (অন্ন বা ধান্য) = শুদ্ধোদন ছিল। শাক্যবংশীয়েরা ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং কৃষিচর্চা তাঁহাদের কর্তব্যমধ্যে গণ্য ছিল। তাঁহারা যাগযজ্ঞ প্রভৃতি শাস্ত্রানুষ্ঠান এবং জ্যোতিষী ও দৈবজ্ঞের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করিতেন। এ সময়ে বৈদিক ব্রহ্মণ্যধর্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ তপশ্চরণাদি করিতেন। ইহার মূলে যাহাই থাকুক না কেন, অনেক ধনীপুত্রও

এই পথের পথিক হইয়াছিলেন। সুতরাং তরুণ গৌতমের মনে এই ভাব উৎপন্ন হওয়া অস্বাভাবিক নহে। গৃহত্যাগই সন্ন্যাসগ্রহণের প্রধান ও প্রথম সোপান এবং গৃহত্যাগে তপশ্চরণের সুবিধা, সুতরাং তিনি (অশ্বপৃষ্ঠে বা রথারোহণে) গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রচলিত কৃচ্ছ্র সাধনে ও শরীর-নিগ্রহে উগ্রতপস্যা করার পথও প্রথমে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নিষ্ফল ও প্রাণান্তকর বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সাধারণের মধ্যে বুদ্ধ-প্রচারিত মধ্যপথ তাঁহার ধর্মবিস্তারের পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্মের অনাত্মবাদ বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী। কিন্তু বুদ্ধ নিজে ব্রাহ্মণদ্বেষী ছিলেন না। বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নও ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভিক্ষু সুনীতকে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন,—"পরিশুদ্ধ উদ্যম, পরিশুদ্ধ সংযম ও পরিশুদ্ধ আত্মদমন যাহার মধ্যে দেখিবে, তিনিই ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করিয়াছেন।" সুতরাং অনাত্মবাদ ছাড়িয়া দিলে বৌদ্ধধর্ম বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের আর একটা রূপ এ-ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক।

কাশীতে তাঁহার প্রথম ধর্মচক্রপ্রবর্তনে লোকের ধারণা এইরূপই ছিল। কাশীর বহুব্যক্তি (উঁহাদের মধ্যে যশ নামক ধনীপুত্রও ছিলেন) বোধ হয় এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহার ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্মচক্র বলিতে ধর্মরাজ্য বুঝায়। তিনি নিজে কোনদিন স্বীকার না করিলেও লোকে তাঁহাকে অবতার বলিয়া মনে করিত। বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্ষেত্রবিশেষে উগ্র গোঁড়ামি অনেককেই তখন এই ধর্মগ্রহণে প্ররোচিত করিয়াছিল, বুদ্ধের এই ধর্মপ্রচারে রাজানুকূল্য বা

রাজসহায়তা যথেষ্ট ছিল। রাজার ছেলে সন্ন্যাসী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন আকর্ষণও অনেকের ছিল। সর্বাপেক্ষা পরোপকার-স্পৃহা ও মৈত্রী (মেত্তি) তাঁহার ধর্মকে একটা বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল। উচ্চনীচভেদরাহিত্য ও সর্বজাতিকে ভিক্ষুশ্রেণীতে গ্রহণ তাঁহার ধর্মকে যথেষ্ট লোকপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে সম্রাট কণিষ্কের সময়ে বৌদ্ধধর্মসঙ্ঘে হীনযান ও মহাযান নামে দুইটি শাখার উৎপত্তি হয়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে কিছুদিন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেখা গেলেও মধ্যযুগে পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুত্থানে ইহা হীনবল হইয়া পড়ে। কিন্তু ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্মাশ্রিত অন্যান্য দেশে তদ্রূপ হয় নাই। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়।

বর্তমান যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ও গৌরব ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করিয়াছেন বিদেশী পণ্ডিতগণ। বুদ্ধের মহান্ নাম ও বিরাট জীবনের অন্তরালে এমন একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল যাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া স্তূপে, চৈত্যে, বিহারে, কুটীতে, শিলালিপি ও শিলাচিত্রে,—সর্বত্রই ইতিহাসের পদক্ষেপচিহ্ন সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছে। যে সকল মহাযান ও হীনযান গ্রন্থ সিংহলে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে, ব্রহ্মে ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে অপসৃত, বিস্মৃত বা লুক্কায়িত অবস্থায় ছিল তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার ও সেই সকল মূলগ্রন্থ পাওয়া না গেলেও তাহার কোন প্রতিলিপি বা অনুবাদ সংগ্রহ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা দেখা দিয়াছে এবং পাশ্চাত্য ভাষায় বুদ্ধ সম্বন্ধে গবেষণামূলক নানা গ্রন্থ রচিত হইয়া বুদ্ধের জীবন ও ধর্মের উপর নূতন আলোকপাত করা হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধ যে বর্তমানে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর প্রধান আলোচ্য বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

খ্রীষ্টধর্মের যাজকগণ যেরূপ দেশে দেশে গিয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিয়া থাকেন বুদ্ধও একদিন সেইরূপ করিতেন। অনেক সময় তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীও তাঁহার আদেশে অপরকে প্রব্রজ্যাদান করিতেন। তাঁহার দশজন প্রধান শিষ্য কাশ্যপ, আনন্দ, সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, অনিরুদ্ধ, সুভূতি, পূর্ণ, কাত্যায়ন, উপালি ও রাহুল বুদ্ধের ধর্মপ্রচারার্থে নানাস্থানে যাইতেন। খ্রীষ্ট ধর্মে ও বৌদ্ধ ধর্মে দশশীল সম্বন্ধীয় নির্দেশ প্রায় একই প্রকার। ইহাতে কোন এক সময়ে খ্রীষ্ট ধর্মের উপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন। বুদ্ধের নারী ধর্ম-যাজিকাগণও ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

পালি সুত্তপিটকের জাতক নামক বিরাট অংশে বুদ্ধদেবের পূর্ব পূর্ব জন্মের বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সৎকার্যের পর সৎকার্য করিতে করিতে ক্রমোন্নতির চরম সোপানে উঠিয়া গৌতম কিভাবে বুদ্ধ-জন্মলাভ করিয়াছিলেন তাহার মনোহর বিবরণ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। নীরস শুষ্ক ধর্মতত্ত্বব্যাখ্যার সমতালে লোকপ্রিয় জাতক রচনা গভীর মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচায়ক।

বুদ্ধের সমসাময়িক কতকগুলি মতবাদ তৎকালে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নিগ্রর্ন্থ বা জৈন সম্প্রদায়, আজীবিক সম্প্রদায়, অজিতকেশকম্বলীর সম্প্রদায়, সঞ্জয় বৈরাটীপুত্রের সম্প্রদায়, ককুদ্ কাত্যায়নের সম্প্রদায় প্রভৃতি। এইসব সম্প্রদায়ের গুরুদের মধ্যে জৈন মহাবীরের নাম সুবিখ্যাত। এই সকল সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে বিলক্ষণ রেষারেষি চলিত। অগ্নি-উপাসক সম্প্রদায় বলিয়া আর এক সম্প্রদায়ও যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচারের পর কতকগুলি

সম্প্রদায় তাঁহার সঙ্গে যোগদান করায় তাহাদের অস্তিত্ব ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

বৌদ্ধশাস্ত্র-পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ নহে। বহুগ্রন্থের সন্ধান হয়ত চেষ্টা করিলে এখনও ভারতবর্ষে কোথাও-না-কোথাও মিলিতে পারে। কিন্তু যে সকল সুপ্রাচীন গ্রন্থ নানা কারণে চিরদিনের জন্য অন্যদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সন্ধান আর পাওয়া যাইবে না। ভারতবর্ষের বাহিরের বহুদেশ হইতে বহু ছাত্র অধ্যয়নের জন্য ও বহু পর্যটক জ্ঞানলাভের জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছেন এবং অনেক সময়ে তাঁহারা এই সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি গোপনে দেশান্তরে লইয়া যাইতেন, ইহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্ররাশি কতক অনলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও কতক অন্যদেশে সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল এবং তিব্বতের দুরধিগম্য পার্বত্য মঠে, সিংহলের পর্বতগুহায়, চীনের অজ্ঞাত ভগ্ন মন্দিরে, কোথায় যে সেগুলি লুক্কায়িত আছে কে তাহার সন্ধান পাইবে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য মনে হয় বৌদ্ধ ধর্মের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ হইতে তাহার ক্রমশঃ বিলুপ্তি। যে ধর্ম একদিন জগতের কাছে ভারতের গৌরব বাড়াইয়া দিয়াছিল, আজ তাহার বর্তমান পরিণতি এই ভারতবর্ষেরই বুকে বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। বুদ্ধ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আড়াই হাজার বৎসর পরে প্রাচ্য দেশের সর্বত্র বুদ্ধকে লইয়া যে চাঞ্চল্য ও ভাবপ্রবণতা দেখা দিয়াছে ও তাঁহার পঞ্চশীল বা দশশীল লইয়া যে ভাবে জগতে শান্তি আনয়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে বুদ্ধের মাহাত্ম্যই সম্যক্ পরিস্ফুট। তাঁহার অহিংসাবাণীই একমাত্র জগতে শান্তি আনয়ন করিতে পারে, এ ধারণা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশের মনীষিগণ পোষণ করিতেছেন।

"ভগবান বুদ্ধদেব" গ্রন্থ-রচনায় আমি বহু পুস্তক হইতে সাহায্য পাইয়াছি। যে সকল সুধী বান্ধব আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন ও উপদেশ দিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, বিশেষতঃ সুবিখ্যাত শিল্পী বন্ধুবর শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় নানা বিষয়ে সহায়তা করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে হিমালয়ের নিচে কপিলবাস্তু নামে ছিল এক নগর। শুদ্ধোদন ছিলেন সেখানকার রাজা। তাঁর রাজ্য বর্তমান নেপাল রাজ্যের দক্ষিণাংশ জুড়ে অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কপিলবাস্তুর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে রোহিণী নদী। প্রজারা রাজা শুদ্ধোদনের শাসনে সুখেই ছিল। সুখ ছিল না শুধু রাজার মনে। রাজার দুই রানী, বড় রানী মহামায়া, ছোটরানী গৌতমী। এঁরা দুজনে আবার দুবোন। কিন্তু কোন রানীরই ছেলেপুলে হয় নি। রানীদের বয়স অনেক হল, কিন্তু কারোর মনে সুখ নেই। সারা রাজপ্রাসাদ যেন কি এক গভীর দুঃখে ভরে থাকত। রাজা ভাবতেন—বৃথাই আমার এ রাজত্ব, আমার মৃত্যুর পরেই লোপ পেয়ে যাবে আমার বংশ! আমার প্রজারা কত সুখী, তাদের ঘর জুড়ে ছেলেপুলের আনন্দ কলরব উঠছে। আর আমার?

রাজা শুদ্ধোদন কত দানধ্যান করলেন, কত দেবতার আরাধনা করলেন, কত অতিথিসেবা করলেন।

একদিন বড় রানী তাঁর এক আশ্চর্য স্বপ্নের কথা রাজাকে বললেন,—মহারাজ, এক আশ্চর্য ব্যাপার স্বপ্নে দেখেছি। একটি শাদা হাতী অপরূপ জ্যোতির মধ্য দিয়ে এসে যেন আমার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করল।

রাজা এ কথায় খুবই বিস্মিত হলেন। তাঁর মনে হল, তবে কি এতদিন পরে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন, এবার সত্যিই কি তাঁর আশা পূর্ণ হবে?

হলও তাই। ক্রমে তিনি জানতে পারলেন, বড়রানী মহামায়া গর্ভবতী হয়েছেন। এবার আর তাঁর আনন্দ ধরে না। রাজ্যময় আনন্দের স্রোত বয়ে গেল! ছোটরানী গৌতমীরও আনন্দের সীমা নেই। রাজবাড়ীতে কত যাগযজ্ঞ চলতে লাগল।

রাজা শুদ্ধোদন রানী মহামায়ার কোন সাধই অপূর্ণ রাখেন না। যখন যা চাইছেন তিনি, রাজা তখনই তা পূর্ণ করছেন। এমনি করে দিন এগিয়ে চলল, অবশেষে ঠিক দশমাস দশদিনের সময়ে রানীর বেড়াবার শখ হল। তিনি বললেন—মহারাজ, আপনার লুম্বিনী নামে যে বাগান আছে, আমার আজ সেখানে যেতে খুব সাধ হয়েছে।

রাজা এ কথায় একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। লুম্বিনী বাগান রাজধানী হতে একটু দূরে, রোহিণী নদীর তীরে। রানীর যে অবস্থা, তাতে রথে চড়ে অতদূর যাওয়া কি ঠিক হবে? নদীর অপরপারে দেবদহ নামে আর একটি নগর। সেখানে আবার রানীর বাপের বাড়ী।

রানী কিন্তু বারবার তাঁর আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করতে লাগলেন। রাজা আর প্রতিবাদ করলেন না। খুব ভাল একখানা রথে নরম বিছানার উপর বসে রানী মহামায়া চললেন লুম্বিনী বাগানে। সঙ্গে চললেন তাঁর সখীরা।

সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমা। জলে স্থলে আকাশে এক অপূর্ব আনন্দ-হিল্লোল বয়ে চলেছে। রানী লুম্বিনী বাগানের শোভা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু শরীর তাঁর বড় ক্লান্ত। তিনি একটি প্রকাণ্ড শাল গাছের নিচে দাঁড়ালেন।

পূবদিকে তখন পূর্ণচন্দ্র উঠবে উঠবে করছে। সমস্ত আকাশে যেমন গোধূলির রং একটু একটু ফিকে হয়ে আসছে, তেমনি পূবদিকের আকাশে তখন রূপালী আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ সখীদের কাছে ডাকলেন মহামায়া। তাঁর শরীর যেন অবসন্ন হয়ে আসছে। তারপর ঠিক যখন পূর্ণচন্দ্র পূবদিকের আকাশে দেখা দিল, তিনি তখনই প্রসব করলেন সেই শালগাছের নিচে জগতের পূর্ণচন্দ্র তথাগত সিদ্ধার্থকে।

রাজার কাছে তখনি সংবাদ গেল। রাজ্যশুদ্ধ লোক ভিড় করে এল লুম্বিনী বাগানের চারধারে। রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করেছেন, একথা প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য জুড়ে উৎসবের স্রোত বইতে লাগল। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনিতে কেঁপে উঠল আকাশ বাতাস। আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে উঠল সারা রাজ্য। রাজপ্রাসাদের ত কথাই নেই। আজ রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে, প্রজাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে,—তাই শিশুর নাম রাখা হল সিদ্ধার্থ।

দিনে দিনে বাড়তে লাগলেন শিশু সিদ্ধার্থ। রাজা লক্ষ্য করেন, এ শিশু যেন সাধারণ শিশু নয়। ঘুমন্ত অবস্থাতেও

শিশুর মুখে ফুটে ওঠে অপার্থিব জ্যোতি, কত ভাবের ছায়া খেলে যায় তার চোখে। কে এই শিশু?

রাজ্যের বড় বড় জ্যোতিষী ও দৈবজ্ঞের দলকে আহ্বান করেন রাজা শুদ্ধোদন। তাঁরা এসে দেখেন, শিশুর অঙ্গের সর্বত্র ফুটে রয়েছে মহাপুরুষের চিহ্ন। সকলেই একবাক্যে বলেন—

মহারাজ, এ ত সামান্য শিশু নয়। যদি ইনি গৃহে থাকেন তবে জগতের একছত্র নরপতি হবেন, আর যদি গৃহ ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন, তবে এঁর জ্যোতিতে সমগ্র জগৎ আলোকিত হবে।

কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও গভীর বেদনার ছায়া নেমে এল। সিদ্ধার্থকে প্রসব করে বড়রানী মহামায়া বেশীদিন আর জগতে

রইলেন না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হল। তখন শিশু-পালনের ভার পড়ল ছোটরানী গৌতমীর উপর। তিনি সিদ্ধার্থকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ সাগরে ডুবে গেলেন।

ক্রমে সিদ্ধার্থ বড় হতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গীরা সর্বদা কাছে থাকলেও মাঝে মাঝে তিনি তাদের ছেড়ে গভীর বনের মধ্যে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতেন। কখনও কারোর মনে ব্যথা দিতেন না। পশু পাখী কীট পতঙ্গ সবই যেন তাঁর স্নেহ পেয়ে ধন্য হতে লাগল। অপূর্ব জ্যোতিতে তাঁর কিশোর দেহ ভরে উঠল। সকলেই মুগ্ধ চোখে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতেন।

তাঁর কিশোর বয়সে একদিন বনের মধ্যে তিনি বসে বসে কত কি ভাবছেন, হঠাৎ তাঁর কোলের উপর পড়ল এক আহত হংস। ডানায় তার তীর বেঁধা, যাতনায় ছট্‌ফট্ করতে করতে সে করুণ নয়নে সিদ্ধার্থের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

সিদ্ধার্থ অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর আয়ত চোখদুটি বেদনায় ছলছল করে উঠল। কে এত নিষ্ঠুর যে এই নিরীহ পাখীকে এমন ভাবে তীর মেরেছে! তিনি তখনই আস্তে আস্তে তীরটি বার করে পাখার ক্ষতস্থানে দূর্বারস দিলেন। ডানায় তীর লেগেছিল। দু'-একটি পালক ঝরে পড়ল সিদ্ধার্থের হাতের উপর। পাখীটি যেন স্নেহের স্পর্শ বুঝতে পেরে তাঁর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল পরম নিশ্চিন্ততায়।

পরক্ষণেই সিদ্ধার্থের জ্ঞাতিভাই দেবদত্ত সামনে এসে দাঁড়ালেন। সিদ্ধার্থকে বললেন—ওটা আমার হাঁস, আমিই ওকে তীর মেরে আকাশ থেকে নামিয়ে এনেছি। ওটা আমাকে এখনি দাও।

সিদ্ধার্থের চোখদুটি করুণায় কোমল হয়ে উঠল। তিনি

বললেন—কেন তুমি একে তীর বিঁধলে?—এ হাঁস ত তোমার কোন অনিষ্ট করেনি ভাই!

—কিন্তু তবু এ হাঁস আমার। আমি ওটাকে চাই। আমারই তীরে মাটিতে পড়েছে। দাও ওকে।

—না, পাবে না। এ এখন এসেছে আমার কোলে। এখন এ হাঁস আমার।

—সিদ্ধার্থ!

—ভাই!

—তুমি দেবে না এ হাঁস?

—দেব ভাই, কিন্তু তোমার কাছে নয়। আমি ওকে ছেড়ে দেব আবার ঐ উদার আকাশের বুকে। তোমার তীর বিঁধেছে ওর ডানায়, তাই ও মরেনি। কিন্তু বল ত দেবদত্ত, এ জীবহিংসা

করে লাভ কি? পৃথিবীর বুকে সকলেরই সমান অধিকার, দুর্বলের প্রতি সবলের এ আক্রমণ কেন ভাই?

তারপর সিদ্ধার্থ হাঁসটিকে আদর করে উঁচু করে ধরলেন। এতক্ষণে বোধ হয় সে অনেকটা বল পেয়েছিল, এবার তার আহত ডানা মেলে ধীরে ধীরে উড়ে গেল বাতাসের বুকে।

হাঁসের দিকে চেয়ে চেয়ে সিদ্ধার্থের চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। তারপর ফিরে দেখলেন, দেবদত্ত চলে গেছেন।

এদিকে বয়স বাড়তে লাগল সিদ্ধার্থের। পণ্ডিতদের কাছে নানা বিদ্যা শিখতে লাগলেন তিনি। তাঁর প্রতিভার কাছে পণ্ডিতদের জ্ঞান যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। মহারাজ শুদ্ধোদন এসব কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন, কিন্তু দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁকে মাঝে মাঝে চিন্তিত করে তুলল। এমন প্রতিভা যার, সত্যই কি সে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে এ রাজসুখ তুচ্ছ করে?

নানা ভোগবিলাসের মধ্যে সিদ্ধার্থকে ডুবিয়ে রাখা হল। নৃত্যগীত, ক্রীড়াকৌতুক কোন কিছুই বাদ গেল না। সিদ্ধার্থও নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। কিন্তু তবুও তাঁর যেন কোন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে তিনি যেন এক গভীর চিন্তায় ডুবে যেতেন।

এদিকে মহারাজ শুদ্ধোদনের বয়স বাড়ছিল। তিনি ক্রমশঃ জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন। চিকিৎসকেরা উপদেশ দিলেন—মহারাজ, আপনার শরীরে জরা দেখা দিয়েছে। এটা সময়ধর্ম। তবুও আমাদের মতে আপনাকে অজর গাছের পাতার রস নিত্য খেতে হবে।

—অজর গাছ?

—হাঁ, মহারাজ, অজর গাছ। এই মহানগরীর দক্ষিণে দশ ক্রোশ দূরে এক নিভৃত স্থানে আছে এই অজর গাছ। স্থানটি দুর্গম, আর গাছটিকেও চেনা শক্ত। তবে তার বর্ণনা আমরা দিয়ে দিচ্ছি, এ গাছ চিনে নিয়ে আসবার অধিকার একমাত্র রোগীর আত্মজ অর্থাৎ পুত্রের আছে। সুতরাং কুমার সিদ্ধার্থ ভিন্ন এ গাছের পাতা আর কে আনবে?

চিকিৎসকেরা বিদায় নিলেন, রাজা ডাকলেন পুত্রকে।

—সিদ্ধার্থ!

—আদেশ করুন পিতা।

মহারাজ পুত্রকে সব কথা বললেন। সিদ্ধার্থ হেসে বললেন, এ আর শক্ত কাজ কি? আমিই যাব অজর গাছের পাতা আনতে।

—কিন্তু কোনও স্থানে বিলম্ব করো না বৎস।

—না, পিতা।

—পায়ে হেঁটেই যাবে কিন্তু।

—যথা আজ্ঞা। —প্রণাম করে সিদ্ধার্থ চলে গেলেন দূরে—বনের মধ্যে অজর গাছের সন্ধানে।

নির্জন বন। কেউ সহজে সেই গভীর বনে ঢোকে না। একটা কালো ছায়া সর্বদা যেন বনভূমিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নির্ভয় হৃদয়ে সিদ্ধার্থ এগিয়ে চলেছেন, আর প্রত্যেক গাছটি পরীক্ষা করছেন। বনের মধ্যে অনেক দূর চলে গেছেন তিনি। হঠাৎ নারী-কণ্ঠের সুললিত সঙ্গীত তাঁর কানে এসে লাগল। আহা কি মধুর সুর! সিদ্ধার্থ থমকে দাঁড়ালেন, এমনটি যেন কোথাও শোনেন নি তিনি। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখতেই হঠাৎ সামনের লতাকুঞ্জের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল এক সুন্দরী তরুণী।

—কে তুমি? —সিদ্ধার্থ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

—আমি বনবালা। কিন্তু তুমি কোথায় চলেছ একাকী বনের মধ্যে?

—অজর গাছের সন্ধানে।

—সে গাছ আমি যে চিনি! এখনি ঠিক চিনিয়ে দেব তোমাকে। তা' এত তাড়া কিসের? বোস না একটু আমার কাছে। আমি তোমাকে যেতে দেব না। থাকবে এখানে?

—না, তা হয় না। আমার পিতা পীড়িত। আমাকে এখনি গাছের পাতা নিয়ে ফিরতে হবে।

—আমার গান শুনবে না?

—না। আমাকে গাছ চিনিয়ে দাও!

—আমার কাছে বসবে না?
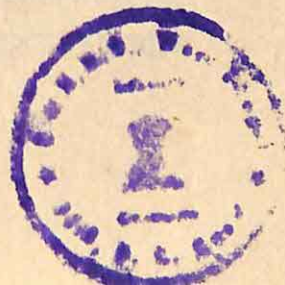
—না, আমাকে এখনি ফিরে যেতে হবে।

—তা' হলে গাছ আর চিনিয়ে দেব না। পার ত নিজেই খুঁজে নাও।

—বেশ। আমার পথ ছাড়।

খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে তরুণী। সিদ্ধার্থ ক্রোধে দ্রুতবেগে এগিয়ে যান বনের মধ্যে।

ঐ ত গাছ। ঐরকমই ত শুনেছেন তিনি।

পাতা নিয়ে তিনি ফিরে এলেন মহারাজ শুদ্ধোদনের কাছে।

রাজা পথের বৃত্তান্ত সব শুনতে চাইলেন। সিদ্ধার্থ কোন কিছুই গোপন করলেন না, সেখানে সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাও বললেন।

রাজা শুনে একটু চিন্তিত হলেন। সিদ্ধার্থকে বিদায় দিয়ে তিনি ডেকে পাঠালেন মন্ত্রীকে, তাঁকে সিদ্ধার্থের সে বয়সেও প্রলোভন-জয়ের কথা বললেন।

—এখন উপায় কি মন্ত্রী ?

—মহারাজ, নারীর প্রতি কোন আসক্তি নেই রাজকুমারের। এতে তাঁর সংসারের প্রতি বৈরাগ্য-সূচনা দেখা যাচ্ছে। আমি আপনার আদেশেই রাজকুমারের মনে আসক্তি জন্মাবার উদ্দেশ্যে বনমধ্যে ঐ সুন্দরী নারীকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু বয়সে তরুণ হলেও রাজকুমারের মনে কোন অনুরাগই জন্মে নি। আমার মনে হয় রাজকুমারের বিবাহ দিলে হয়ত সংসারের প্রতি আসক্তি জন্মাতে পারে।

মন্ত্রীকে বিদায় দিয়ে রাজা শুদ্ধোদন গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন সিদ্ধার্থের ভবিষ্যৎ। সত্যই কি দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী

সফল হবে—তাঁর একমাত্র পুত্র সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করবে?

এমনভাবে দিনের পর দিন কাটতে লাগল। সিদ্ধার্থ নির্জনে বসে কেবল গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। সংসারের ভোগবিলাস আর তাঁর ভাল লাগে না। তিনি প্রাসাদের এক প্রান্তে তাঁর নিজের ঘরটিতে বসে ধর্মগ্রন্থ পাঠে সময় কাটাতে লাগলেন।

একদিন হঠাৎ তাঁর কানে এল নগরপথের দুন্দুভিধ্বনি। ব্যাপার কি? সমগ্র নগর যেন উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে। ঘন ঘন জন-কোলাহল তাঁর কানে ভেসে আসছে। তিনি তখনই কারণ জানবার জন্যে প্রতিহারিণী ক্ষেমাকে ডেকে পাঠালেন।

—এ দুন্দুভিনাদ কিসের জন্য ক্ষেমা?

—যুবরাজ বোধ হয় ভুলে গেছেন, আজ কপিলবাস্তুর হল-কর্ষণোৎসব। রোহিণী নদীর তীরে কর্ষণক্ষেত্রে এ উৎসব আরম্ভ হবে। মহারাজ যাবেন, আপনি যাবেন, সভাসদ্ অমাত্যেরা যাবেন, আর রাজ্যশুদ্ধ লোক ভিড় করবে সেখানে।

—এবার কি কি হবে?

—মহারাজ স্বয়ং ভূমিতে স্বর্ণহল চালনা করবেন আগের মত। তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন রৌপ্যহল নিয়ে রাজ্যের প্রধানেরা। হলচালনা শেষ হলে উৎসবের আয়োজন করা হবে।

সিদ্ধার্থ আর কিছু বললেন না, শুধু কি এক গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

হলচালনাক্ষেত্রের সামনে প্রকাণ্ড জামগাছের ছায়ায় যুবরাজ সিদ্ধার্থের জন্যে আসন নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। সিদ্ধার্থ সেখানে

গিয়ে বসলেন। মধুর বাদ্যধ্বনির সঙ্গে হলকর্ষণ চলতে লাগল। প্রাচীন ভারতের সে এক অপূর্ব উৎসব! হলকর্ষণ শেষ হ'তে এক প্রহর কেটে গেল, তারপর আরম্ভ হল উৎসব। সে উৎসবে চলবে পশুবধ, মদিরাপান, নৃত্যগীত।

ব্যথিত হয়ে উঠল সিদ্ধার্থের মন। উৎসবে পশুবধ হয় কেন? ভোজ্যদ্রব্য ত জগতে অনেক কিছু আছে।

প্রাসাদে ফিরে এসেই পিতার কক্ষে উপস্থিত হলেন সিদ্ধার্থ, বিনীতভাবে বললেন, উৎসবে এ পশুবধ কি বন্ধ করা যায় না পিতা?

—তুমি ত জান এ আমাদের চিরাচরিত প্রথা, সিদ্ধার্থ।

—যদি পশুবধ বন্ধ করতে না পারেন তবে আমাকে এ রাজ্য থেকে চলে যেতে দিন। এ যে আমার অসহ্য।

—আচ্ছা বেশ, আজ থেকে এ উৎসবে পশুবধ বন্ধ হল। সিদ্ধার্থ চলে গেলে মহারাজ শুদ্ধোদন আবার মন্ত্রীকে ডাকলেন।

—মন্ত্রী, আমার পুত্রের মন দেখছি ক্রমশঃ বৈরাগ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। তুমি শীঘ্র এর বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান কর।

মন্ত্রী একটু চিন্তা ক'রে বললেন—যথা আজ্ঞা মহারাজ। আমি সে আয়োজন অবিলম্বে করছি। আগামী অশোকভাণ্ড-উৎসবে এ রাজ্যের ও কাছাকাছি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কুমারীদের আহ্বান করা হবে। রাজকুমার স্বয়ং তাদের অশোকভাণ্ড বিতরণ করবেন। তার মধ্যে কোনো সুন্দরী কুমারী হয়ত বা যুবরাজের মনোহরণ করতে পারেন।

—বেশ, তুমি অবিলম্বে এ উৎসবের আয়োজন কর।

মন্ত্রী চলে গেলে পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে মহারাজ শুদ্ধোদন নানা চিন্তায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

রাজপুরীতে অশোকভাণ্ড-উৎসব একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। চারদিক থেকে সুন্দরী কুমারীর দল এ-দিন যুবরাজের হাত থেকে সুবর্ণভাণ্ড গ্রহণ করতে আসবেন সৌভাগ্য সূচনায়।

রাজপুরীর প্রকাণ্ড উঠানে চন্দ্রাতপের নিচে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ বিতরণ করছেন অশোকভাণ্ড। দলে দলে কুমারীরা এসে গ্রহণ করছেন সে ভাণ্ড। ভাণ্ডের স্তূপ ক্রমে নিঃশেষ হয়ে এল। আর একটিও অবশিষ্ট নাই। ক্লান্ত সিদ্ধার্থ এবার ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন, হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালেন অপরূপ সুন্দরী এক কুমারী।

—আর ত অশোকভাণ্ড নেই,—মৃদু হেসে বললেন সিদ্ধার্থ।

কুমারীর চোখেমুখে ফুটে উঠল নৈরাশ্যের ছায়া।

—সত্যি ফুরিয়ে গেল? এখন আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে? কিছুই দেবেন না আমাকে?

—তুমি কে? তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো।

—আমি গোপা। দণ্ডপাণি রাজার মেয়ে।

—ওঃ! তিনি যে সম্পর্কে আমার মামা হন। তাইত! কি ভুলটাই আজ হয়ে গেল! আচ্ছা গোপা, অশোকভাণ্ডের বদলে যদি আমার হাতের আংটি দিই, তা হলে ত তোমার আর লজ্জা পাবার কিছুই নেই?

কিন্তু সত্যই গোপার চোখে মুখে লজ্জার লালিমা ফুটে উঠল। তিনি তখন সিদ্ধার্থের কাছে এগিয়ে গিয়ে সলজ্জভাবে বললেন— তবে তাই দাও।

নিজের আংটি খুলে সিদ্ধার্থ নির্বিকারচিত্তে গোপার আঙুলে পরিয়ে দিলেন।
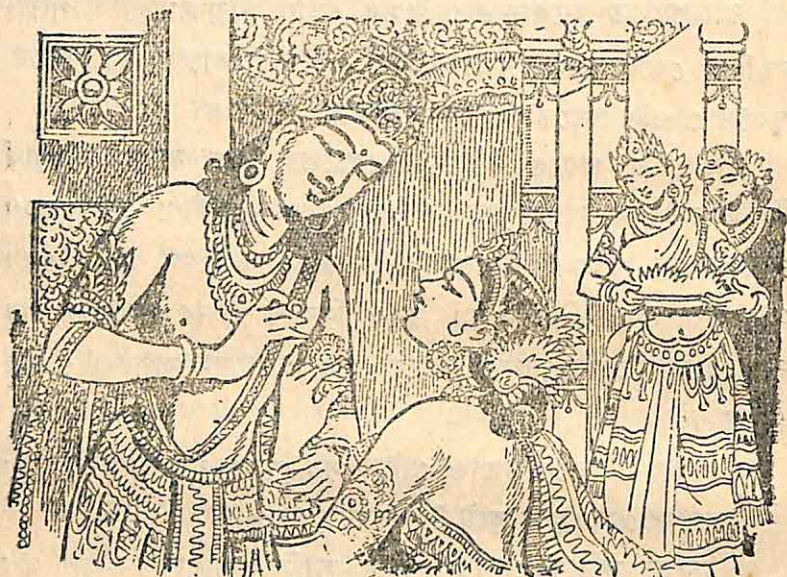
—কেমন, এবার হয়েছে ত?

—না, হয়নি। তোমার অমন সুন্দর আঙুল খালি থাকবে, এ আমি সহ্য করতে পারব না। এস, আমার আঙুলের আংটি তোমার ও আঙুলে পরিয়ে দিই।

—এতেই যদি তুমি সন্তুষ্ট হও গোপা, তবে তাই দাও।

সিদ্ধার্থের আঙুলে শোভা পেল গোপার আংটি, আর গোপার আঙুলে শোভা পেল সিদ্ধার্থের।

রাজ্যময় কথাটা জানাজানি হতে আর দেরী হল না। মহারাজ শুদ্ধোদন মনে মনে হাসলেন। দণ্ডপাণি রাজার কাছেও

খবর পাঠালেন তিনি। মাতুল ও পিতার একান্ত আগ্রহে গোপার সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল সিদ্ধার্থের। আংটি বদলের পর গোপার পাছে অমর্যাদা হয় এই কথা ভেবে সিদ্ধার্থ মত দিয়েছিলেন এ বিবাহে।

কিছুদিন উৎসবের মধ্যে খুব আনন্দে দিন কাটতে লাগল সিদ্ধার্থের। পাছে ছেলের মনে আবার বৈরাগ্যের ছায়া এসে পড়ে, তাই রাজা শুদ্ধোদন আদেশ দিলেন তাঁর রাজ্যে যুবরাজের সামনে এমন কিছু যেন না পড়ে যাতে তাঁর মনে কোন বৈরাগ্যের চিন্তা আসে। সারাক্ষণ শুধু আনন্দ ও উৎসব চলুক রাজপুত্রকে ঘিরে।

অপরাহ্ন বেলায় রথে চড়ে সিদ্ধার্থ চলেছেন প্রমোদ-উদ্যানে। সারথি ছন্দক রথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিছুদূর যেতেই রথের সামনে পড়ল এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। হেঁটে চলেছেন ধীরে ধীরে। তাঁর দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ। রক্ত, মাংস, চর্ম, স্নায়ু সমস্তই যেন শুকিয়ে গেছে। কেশ সাদা। মুখে দাঁত নাই। কাঁপতে কাঁপতে তিনি চলেছেন পথে।

সিদ্ধার্থ ছন্দককে রথ থামাতে বললেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা ছন্দক, সামনের ও লোকটি দেখতে অত ক্ষীণ আর দুর্বল কেন? অত আস্তে আস্তে চলছেনই বা কেন?

ছন্দক বললেন—যুবরাজ, ঐ লোকটির বয়স অনেক হয়েছে। উনি জরাগ্রস্ত।

—জরা? সেটা কি ছন্দক?

—যুবরাজ, মানুষের বয়সের সঙ্গে ওটা আসে। তখন যৌবনের

তেজ, যৌবনের রূপ আর থাকে না। ওটা সকলের জীবনে আসবেই। আপনি ত দেখেছেন মহারাজের শরীরেও জরা দেখা দিয়েছে।

—এটা কি নিবারণ করা যায় না?

—না যুবরাজ।

—ফেরাও রথ ছন্দক, আজ আর প্রমোদ-উদ্যানে যেতে ভাল লাগছে না।

সেদিন সিদ্ধার্থ ফিরে এসে নিজের ঘরটিতে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন রইলেন।

পরদিন অপরাহ্ণে আবার রথে চড়ে প্রমোদ-উদ্যানে যাচ্ছেন, হঠাৎ পথের পাশে দেখতে পেলেন এক ব্যাধিগ্রস্ত লোককে।

লোকটি ব্যাধির যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে, তার গায়ে মলমূত্র লেগে রয়েছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টও সে ভোগ করছে।

—এ আবার কে ছন্দক?

—যুবরাজ, এ লোকটি ব্যাধিগ্রস্ত। শরীর ধারণ করলেই কোন না কোন ব্যাধির যাতনা সহ্য করতে হয়।

—সকলের পক্ষেই কি ব্যাধির আক্রমণ অনিবার্য?

—হাঁ, যুবরাজ।

সেদিনও ফিরে এলেন যুবরাজ পথ থেকেই কত কি ভাবতে ভাবতে।

পরদিন আবার চলেছেন প্রমোদ-উদ্যানে।

এবারও তাঁর সামনে পড়ল এক শবদেহ। শবদেহ বহন করে নিয়ে চলেছে তার আত্মীয়স্বজন কাঁদতে কাঁদতে।

—এ কি ব্যাপার ছন্দক! কে ঐ দড়ির খাটে কাপড়ে ঢাকা লোকটি? আর লোকজন কাঁদছেই বা কেন?

—যুবরাজ, ঐ লোকটির মৃত্যু হয়েছে। ওকে এবার সৎকার করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
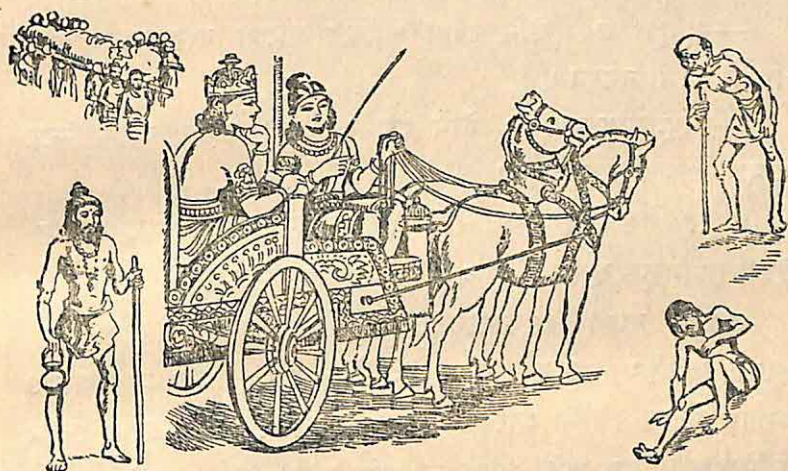
—মৃত্যু! মৃত্যু কি শুধু ঐ লোকটির হয়েছে, না সকলেরই হবে?

—সকলেরই হবে যুবরাজ! মৃত্যুর হাত থেকে কোনদিন কেউ পরিত্রাণ পায় না।

—ফিরাও রথ ছন্দক! আমি আজ আর প্রমোদ-উদ্যানে যাব না।

সেদিনও গভীর চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলেন সিদ্ধার্থ।

পরদিন আবার রথে চলেছেন তিনি প্রমোদ-উদ্যানে। এবার তাঁর সামনে পড়লেন এক প্রশান্ত-মূর্তি সন্ন্যাসী।

—কে ইনি ছন্দক, মুখে শান্তির ছায়া, হাতে ভিক্ষাপাত্র, প্রসন্ন-কল্যাণ হাসিতে মুখখানি ভরে আছে, পরিধানে কাষায় বাস! দেখে মনে হচ্ছে, ওঁর মনে লোভ অহঙ্কার এসব কিছুই নেই।

—উনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, যুবরাজ।

—ইহজগতে কি ওঁর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই?

—না যুবরাজ। উনি সর্বদা শান্তির রাজ্যে বাস করেন আর পরমার্থ চিন্তা করেন।

—সাধু, সাধু ছন্দক! ইনি যে আমারই মনের কল্পনা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন!

এবার কিন্তু সিদ্ধার্থ তখনি পথ থেকে ফিরে গেলেন না, প্রমোদ-উদ্যানের নিভৃত স্থানে গিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন রইলেন।

একথা রাজা শুদ্ধোদনের কানে যেতে দেরী হল না। পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। আরও কঠোর ভাবে তিনি আদেশ প্রচার করলেন, যেন এমন কোন জিনিস আর সিদ্ধার্থের চোখে না পড়ে যাতে তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়।

প্রজারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু সিদ্ধার্থের মনে শান্তি নেই। তাঁর অস্থিরতা ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল। রাজবধূ গোপা স্বামীর এ পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন আর নানাভাবে সিদ্ধার্থের মন থেকে এসব চিন্তা দূর করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

রাজপুরীতে যুবরাজের নিত্য ঘুম ভাঙ্গাত প্রভাত-বন্দিনীর দল। সবে ভোর হয়েছে, সিদ্ধার্থ তখনও শুয়ে আছেন। তাঁর শয়ন-ঘরের কাছে বসে প্রভাত-বন্দিনী গান ধরেছে রাজকুমারকে

জাগাবার জন্যে। তাতে আছে শুধু মিলনের কথা, বিলাসের কথা, কামনার কথা। কিন্তু সিদ্ধার্থের কানে সে গান আনল বৈরাগ্যের বাণী ঃ
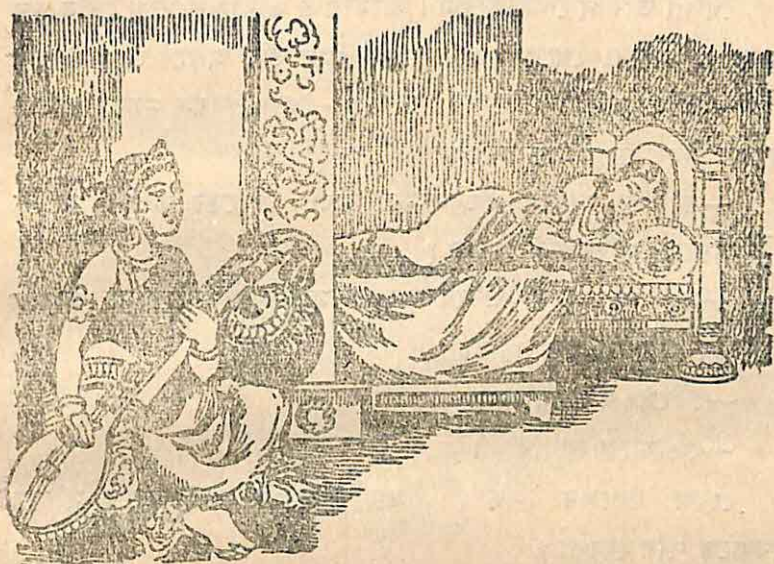
জরা, ব্যাধি, দুঃখ, মরণ, এই সবের আগুনে জ্বলছে এই ত্রিভুবন। কলসীর মধ্যে ভ্রমরকে আবদ্ধ রাখলে সে যেমন ভোঁ ভোঁ করে কলসীর মধ্যেই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বাইরে আসতে পারে না, সেই রকম জগৎও এদের গণ্ডীর বাইরে যেতে পারছে না। শরতের মেঘ যেমন এই আছে এই নেই, ত্রিভুবনের সব কিছুই তেমনি ক্ষণস্থায়ী। রঙ্গভূমির নটেরা যেমন আসে আর যায়, জন্ম-মৃত্যুও সেই রকম এ জগতে যাতায়াত করে। নদীর জলের মতই জীবের আয়ু বয়ে চলেছে, আর বিদ্যুতের মত দেখা দিয়েই কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে।

বৈরাগ্যের আরও কত কি কথা তিনি যেন শুনতে পেলেন এ গানের মধ্যে। চমকে উঠল তাঁর মন। এই কি জগৎ? এই কি জীবন? অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি।

গোপা তাঁর পাশেই ছিলেন। স্বামীর এ ভাবান্তর দেখে তিনি ভয় পেলেন, কোথা থেকে একটা কালো মেঘ তাঁর অন্তরে জমে উঠল।

—তুমি অত কি ভাবছ বলত?—গোপা করুণ নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন।

—ভাবছি মানুষের জীবনের কথা, জগতের কথা। সত্যি কি মানুষের মুক্তি নেই গোপা?

—না, না, তুমি ও-সব কথা আমার কাছে বলো না, আমার মনে বড় ভয় হয়, বড় ভয় হয়।

—কিসের ভয় গোপা?

—তোমাকে হারাবার।

হেসে উঠলেন সিদ্ধার্থ। ভয় করলেই কি সত্যকে সরিয়ে ফেলতে পার গোপা?

গোপার চোখের জলেও কিন্তু সিদ্ধার্থের মন ভিজল না। তাঁর মনে একের পর এক নানা চিন্তা এসে ভিড় করতে লাগল। মানুষের এ দুঃখ-বেদনা কি করে দূর হবে এই ভাবনায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

একদিন রোহিনী নদীর তীরে তিনি বসে আছেন অপরাহ্ণে। তাঁর সামনে জলস্রোতে কাঠের টুকরা যেন মানুষের জীবনের মতই ভেসে চলেছে। তিনি একদৃষ্টে দেখছেন আর কত কথা ভাবছেন, হঠাৎ রথের ঘর্ঘর শব্দে তাঁর চমক ভাঙল।

—যুবরাজ! যুবরাজ!!

রথ থেকে নেমে ছুটে এলেন প্রতিহারিণী কৃশাঙ্গিনী।

—কি হয়েছে কৃশাঙ্গিনী ?—ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করলেন সিদ্ধার্থ।

—শুভ সংবাদ যুবরাজ! রাজবধূ গোপা একটু আগে এক নবকুমার প্রসব করেছেন। পুরস্কার দিন।

—পুরস্কার ? তা হলে দেখছি, আরও একজন মানুষ পৃথিবীতে এল দুঃখ-ব্যাধি-জরা-মৃত্যুর আক্রমণ মাথা পেতে নিতে।

—ও সব কি বলছেন, দিন পুরস্কার।

সত্যই ত, পুরস্কার দিতে হবে প্রতিহারিণী কৃশাঙ্গিনীকে। নিজের কণ্ঠ থেকে বহুমূল্য মণিহার খুলে পরিয়ে তিনি দিলেন তার কণ্ঠে।

প্রতিহারিণী প্রণাম করে আবার ফিরে গেলেন রাজপুরীতে।

রাজপুরীতে চলেছে উৎসব। নাচে গানে আনন্দে ভরে উঠেছে দশদিক। সিদ্ধার্থের পুত্রের নাম রাখা হল রাহুল। মহারাজ শুদ্ধোদন এবার রাজকুমারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। ছেলের মুখ দেখে সিদ্ধার্থ আর কি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে পারেন?

দিনের পর দিন উৎসবের ঢেউ চলল। সিদ্ধার্থের মন থেকে এবার বৈরাগ্যের ছায়া একটু যেন সরে গেল, কিন্তু বেশীদিনের জন্য নয়।

এক শুভরাত্রিতে নবকুমারকে নিয়ে নৃত্যগীত চলেছে, সিদ্ধার্থ উৎফুল্ল মনে সে নৃত্যগীত উপভোগ করছেন। তারপর শেষ রাত্রিতে নৃত্যগীত থেমে গেল। সুন্দরী নর্তকীরা নিদ্রার ঘোরে যে যেখানে পারলেন শুয়ে পড়লেন। ভোর বেলায় সিদ্ধার্থ ভ্রমণে যাবার আগে নাচ-ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেলেন ঘুমন্ত নর্তকীদের। কিন্তু একি মূর্তি তাঁদের? কোথায় গেল সে চমৎকার রূপ, সে সুন্দর হাসি, সে আনন্দময় কটাক্ষ! নিদ্রাঘোরে বীভৎস হয়ে উঠেছে তাঁদের মুখ। কেউ হাঁ করে শুয়ে আছে, মুখ থেকে লালা ঝরছে। কারোর মুখ থেকে রংয়ের প্রলেপ উঠে গিয়ে বিশ্রী দেখাচ্ছে। সিদ্ধার্থ চমকে উঠলেন। তাঁর অন্তরে আবার বৈরাগ্য দেখা দিল। তিনি সে-দিন থেকে আবার অস্থির হয়ে উঠলেন।

গভীর রাত্রি। রাজপুরী নিস্তব্ধ। প্রহরের ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে পুর-রক্ষীর দল। মাঝ-আকাশে চাঁদ হাসছে, আর তার রূপালী জ্যোছনায় স্নান করে হাস্‌ছে যেন পৃথিবী।

মহারাজ শুদ্ধোদন ঘুমের ঘোরে এক দুঃস্বপ্ন দেখলেন—রাজ-

কুমার সিদ্ধার্থ যেন রাজপুরী ছেড়ে কোথায় চলে যাচ্ছেন, অঙ্গে তাঁর সন্ন্যাস বেশ!

ঘুম ভেঙ্গে গেল রাজার। দুঃখে আতঙ্কে চিৎকার ক'রে উঠলেন তিনি। সত্যই কি সিদ্ধার্থ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন, এ তারই পূর্বাভাস? ছেলেকে হারিয়ে তিনি কেমন ক'রে বেঁচে থাকবেন! কিন্তু কেন দেখলেন তিনি স্বপ্ন? এ স্বপ্ন কি শেষে সত্য হবে? না, না, তিনি আর ভাবতে পারেন না। পাগলের মত তিনি ছুটে চললেন সিদ্ধার্থের ঘরের দিকে।

—সিদ্ধার্থ, সিদ্ধার্থ!

দ্বার খুলে বাইরে এলেন যুবরাজ।

—কি হয়েছে পিতা?

—সিদ্ধার্থ!—সস্নেহে অশ্রু-সজলচোখে মহারাজ শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

—এত ব্যাকুল হয়েছেন কেন পিতা?

—বৎস, আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি, তুমি যেন রাজপুরী ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে কোথায় চলেছ। বল সিদ্ধার্থ, তুমি কোনদিন এ রাজপুরী ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে, কোথাও যাবে না,—বল, বল।

সিদ্ধার্থ পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আমি আপনার কাছে শুধু চারিটি জিনিস প্রার্থনা করব পিতা। এই প্রার্থনা পূর্ণ হলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কোনদিন আর গৃহত্যাগ করব না।

—কি কি প্রার্থনা বৎস?

—আমার প্রথম প্রার্থনা, জরা যেন আমাকে আক্রমণ না করে।

—এ যে অসম্ভব!

—আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা, কোনপ্রকার ব্যাধি যেন আমার দেহে কোনদিন আশ্রয়-লাভ না করে।

—এও যে অসম্ভব!

—আমার তৃতীয় প্রার্থনা, আমি যেন চিরদিন যুবা থাকি।

—এ ত হ'তেই পারে না।

—আমার চতুর্থ প্রার্থনা আমি যেন মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাই। কোনদিন যেন মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করতে না পারে।

—এ যে একেবারেই অসম্ভব বৎস, একেবারেই অসম্ভব! তুমি এ সব কি বলছ সিদ্ধার্থ? তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা শুধু আমার পক্ষে কেন, জগতে কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়।

—তবে বলুন পিতা, কি হবে আমার এ রাজসিংহাসনে, কি হবে এসব তুচ্ছ সুখভোগে? বৈরাগ্য-পথই যে প্রকৃত পথ। আমাকে আর বাধা দেবেন না।

মহারাজ শুদ্ধোদন বুঝলেন, দৈবজ্ঞের কথা এবার ফলবার উপক্রম হয়েছে। সিদ্ধার্থকে আর ধরে রাখা চলবে না।

নতজানু হয়ে বসে সিদ্ধার্থ বললেন—তবে আমাকে অনুমতি দিন পিতা, আমি জীবের মুক্তির সন্ধানে যাই, জগৎবাসী যাতে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে তারই সাধনায় আমি আমার জীবন উৎসর্গ করি।

মহারাজ শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের মহান উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। অভিভূতচিত্তে তিনি সিদ্ধার্থকে বললেন—আমি তোমাকে এ অনুমতি দিলাম বৎস, আর আশীর্বাদ করি, তুমি তোমার সাধনায় সিদ্ধি লাভ কর।

পিতার অনুমতি লাভ করে সিদ্ধার্থ নিশ্চিত হলেন, এবার আর তাঁর কোন বাধা রইল না।

কিন্তু গোপা? শিশু রাহুল? এদের কি ক'রে ত্যাগ করবেন তিনি? গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন সিদ্ধার্থ। স্থির করলেন, এদের কাছ থেকে গোপনে সরে যেতে হবে তাঁকে।

ডেকে পাঠালেন তাঁর প্রিয় সুহৃদ্ সারথি ছন্দককে।

সব কথা শুনে ছন্দক ত কেঁদেই আকুল। সিদ্ধার্থের সামনে সজল চোখে দাঁড়িয়ে বললেন—না, না, এ হ'তেই পারে না যুবরাজ! আপনি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন।

—তুমিও কি শেষে আমার শত্রু হলে ছন্দক?

শত্রু!—চমকে উঠলেন ছন্দক। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তবে তাই হোক যুবরাজ। এ জীবনে কোনদিন আপনার আদেশ অমান্য করি নি,—আজও করব না।

—তবে আজই মধ্যরাত্রে রাজপ্রাসাদের গুপ্তদ্বারে রথ প্রস্তুত রাখবে। আর আমার প্রিয় অশ্ব কণ্ঠককে সে রথে যোজনা করবে।

ছন্দক ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

রাত্রি ক্রমে গভীর হয়ে এল। রাহুলকে বুকে জড়িয়ে গোপা ঘুমিয়ে আছেন নিজের ঘরে।

অতি সাবধানে সিদ্ধার্থ প্রবেশ করলেন।

গবাক্ষ দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘুমন্ত গোপা আর রাহুলের মুখের উপর। কি সুন্দর মুখখানি রাহুলের। সিদ্ধার্থ বার বার দেখতে লাগলেন। ক্ষণিকের জন্য বুঝি মন দুর্বল হয়ে পড়ল তাঁর। কিন্তু তিনি তখনি নিজেকে সামলে

নিলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা করছিল রাহুলকে একটিবার কোলে নেন। কিন্তু পাছে গোপা জেগে উঠেন, তাই তিনি সে কাজ করতে পারলেন না।

নীরবে গোপা ও রাহুলের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে
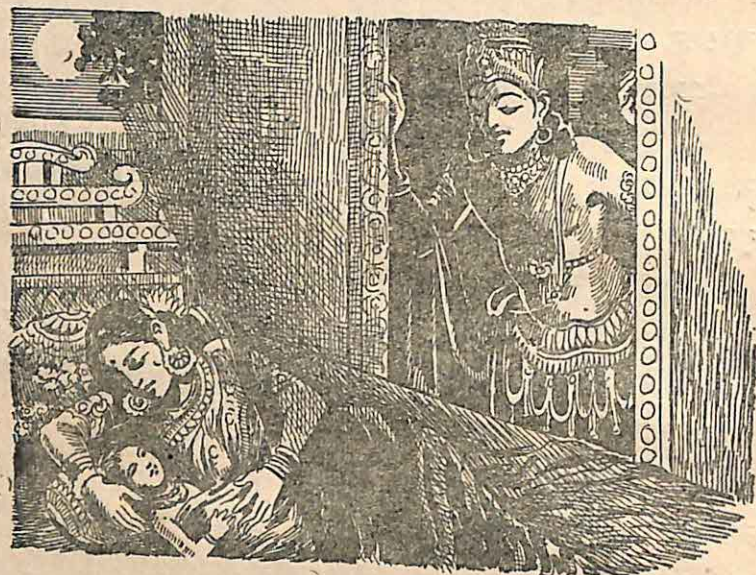
তিনি গুপ্তপথে প্রাসাদের বাইরে এলেন। ছন্দক রথ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সিদ্ধার্থ রথে উঠতেই তিনি ধীরে ধীরে রথ চালনা করলেন।

সমস্ত কপিলবাস্তু তখন নিদ্রামগ্ন। কেউ জানতে পারল না, যুবরাজ সিদ্ধার্থ রাজ্য ছেড়ে মহানিক্রমণ করলেন।

ক্রমে তিনি অনেকখানি পথ অতিক্রম করলেন। এবার উষার আলো দেখা দিল পূব দিকে।

—বলতে পার ছন্দক, কোথায় এলাম ?

—মৈনেয় প্রদেশের বেণুবনে, যুবরাজ।

—তবে রথ থামাও, আর তোমার যাবার প্রয়োজন নেই।

রথ থেকে নেমে সিদ্ধার্থ তাঁর অঙ্গের বহুমূল্য উত্তরীয় অলঙ্কার সব খুলে ছন্দকের হাতে দিলেন।

—নিয়ে যাও ছন্দক এসব। কি হবে আমার আর উত্তরীয় অলঙ্কারে? তোমাকে শুধু আমার একটি অনুরোধ,—আমার বৃদ্ধ পিতার দিকে একটু লক্ষ্য রেখো, আর তাঁকে প্রবোধ দিও।

ছন্দক অশ্রুসজল চোখে রথ ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। এবার সিদ্ধার্থ অগ্রসর হতে লাগলেন বেণুবনের মধ্য দিয়ে।

তাঁর মনে হল, যাক্, আভিজাত্যের সব বন্ধন খসে গেল। আজ আমি অতি দীন। আজ আমি ভিক্ষুক।

বনের মধ্য দিয়ে খানিক দূর যেতে তাঁর চোখে পড়ল এক ব্যাধ। পরণে তার ছেঁড়া ময়লা কাপড়।

সিদ্ধার্থ ভাবলেন, এর সঙ্গে কাপড় বদল করাই ভাল। তখনি ডাকলেন তিনি ব্যাধকে।

ব্যাধ কাছে আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—দেবে তুমি আমাকে তোমার ঐ ছেঁড়া কাপড়? আমি আমার এ কাপড়খানা তোমাকে দিচ্ছি।

ব্যাধ ত অবাক্! এ লোকটা বলে কি! এমন সুন্দর চেহারা, চোখেমুখে কি মধুর ভাব। ছলনা করতে কোন দেবতা এল না কি! ব্যাধ প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না, শেষে সিদ্ধার্থ অনেক বুঝিয়ে তার ছেঁড়া কাপড়খানি নিজের কাপড়ের সঙ্গে বদলে নিলেন।

ব্যাধ চলে যাচ্ছিল, সিদ্ধার্থ আবার তাকে ডাকলেন,—শোন—

—কেন দেবতা?

—আমি দেবতা নই, তোমাদেরই মত একজন মানুষ। এখন দাও দেখি তোমার হাতের অস্ত্রখানা।

—কি করবে তুমি এ নিয়ে?—প্রশ্ন করল ব্যাধ।

—দেখই না কি করি।

এবার অস্ত্র হাতে নিয়ে তিনি তাঁর মাথার চমৎকার চুল সব কেটে ফেললেন। একেবারে সন্ন্যাসীর বেশ।

আশ্চর্য হয়ে ব্যাধ চলে গেল। তিনিও এগিয়ে চললেন।

এদিকে সকাল হতেই রাজপুরীতে, শেষে সারা কপিলবাস্তুতে, হাহাকার পড়ে গেল। কোথায় কুমার সিদ্ধার্থ? কোথায় তিনি?

তখনি অশ্বারোহীর দল ছুটল চারদিকে।

সিদ্ধার্থকে কোথাও পাওয়া গেল না, কিন্তু বেচারা ব্যাধ ধরা পড়ল রাজার অনুচরদের হাতে। তাকে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এল তারা রাজসভায়।

—এ কাপড় তুমি কোথায় পেলে? এ যে রাজকুমারের কাপড়।

কাঁপতে কাঁপতে ব্যাধ সব কথা বলল।

ঠিক এই সময়ে ছন্দকও হাহাকার করতে করতে সিদ্ধার্থের অঙ্গের উত্তরীয় ও অলঙ্কার নিয়ে উপস্থিত হলেন রাজসভায়।

সকল সন্দেহ তখনি মিটে গেল। রাজকুমার সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছেন, আর ফিরবেন না তিনি গৃহে।

ব্যাধ মুক্তি পেল। রাজকুমারের সন্ন্যাসী হওয়ার সংবাদে গোপা, গৌতমী ও মহারাজ শুদ্ধোদন মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, রাজ্য জুড়ে হাহাকার ধ্বনি উঠল।

ওদিকে সিদ্ধার্থ চলেছেন সন্ন্যাসী বেশে গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে। কেউ কিছু ভিক্ষা দিলে খান, নইলে উপবাস করেন। এমনিভাবে চলতে চলতে তিনি উপস্থিত হলেন বৈশালী নগরীতে।

গঙ্গার তীরে এই বৈশালী নগরী। সিদ্ধার্থ গঙ্গাস্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে তীরে উঠে সবেমাত্র দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ কে একজন তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন।

—কে তুমি ?—সিদ্ধার্থকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

—আমি সন্ন্যাসী।

—কিন্তু এমন দেবদুর্লভ রূপ মানুষের কদাচিৎ হয়। সত্য বল, কে তুমি ?

—আমি ত আপনাকে বলেছি, আমি সন্ন্যাসী।

—বেশ, তবে এস আমার সঙ্গে। আমিও সন্ন্যাসী, আমার নাম আলাড় কালাম। কাছেই আমার আশ্রম।

সিদ্ধার্থ চললেন তাঁর আশ্রমে। কিন্তু এইভাবে সন্ন্যাসীর আশ্রমে বাস করা তাঁর ভাল লাগল না। কিছুদিন পরে তিনি গেলেন রাজগৃহে।

রাজগৃহের রাজা তখন বিম্বিসার। তাঁর কাছে সংবাদ গেল, কে একজন সুদর্শন পুরুষ এসেছেন তাঁর রাজ্যে, ভিক্ষা করছেন তিনি দ্বারে দ্বারে। সুন্দর তাঁর স্বভাব, মধুর তাঁর কথা। মহারাজ বিম্বিসার এলেন সিদ্ধার্থের কাছে। তাঁর পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন তিনি।

—এ রাজ্য আপনারই। আপনি এখানে ইচ্ছামত বাস করুন।

—রাজ্যে ত আমার প্রয়োজন নেই মহারাজ। আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।

—কিন্তু এ নবীন বয়সে কেন আপনার এ কঠিন ব্রত? আপনার কি এ জগতে সুখভোগের কোনো কামনাই নাই?

—মহারাজ, কামনার ত কোনোদিনই নিবৃত্তি হয় না। মানুষের সুখভোগের তৃষ্ণা কোনোদিনই মেটে না। এই নশ্বর দেহে কি হবে অতৃপ্তির আগুন জ্বেলে?

—হে মহাপুরুষ, তবে আপনি কি চান?

—বুদ্ধত্ব। যার বলে জরা-ব্যাধি-মরণের আক্রমণ ব্যর্থ করবার পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

—তবে কথা দিন, আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করবার পর এ রাজ্যে আবার ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন?

—বেশ, কথা দিলাম।

প্রণাম ক'রে মহারাজ বিম্বিসার ফিরে গেলেন। সিদ্ধার্থ চললেন জ্ঞানের সন্ধানে, আলোর সন্ধানে।

কিন্তু কোথায় সে জ্ঞান, কোথায় সে আলো? বন, নদী, পাহাড় পার হয়ে তরুণ সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ খুঁজে ফিরছেন তাঁর চরম সাধনার পথ। ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলে গেছেন, পায়ে হেঁটে চলেছেন গ্রামের পর গ্রামে।

বনপথের এক পার্শ্বে দেখা পেলেন তিনি সাধু রুদ্রকের। জানালেন, তিনি তাঁর কাছে নিজ অভিপ্রায়।

—কিন্তু এ যে বড় কঠিন সাধনা। চিন্তিত মনে বললেন রুদ্রক।

—আপনি আমায় এ সাধনায় দীক্ষা দিন।

—বেশ, আমি তোমাকে যোগশিক্ষা দেব। এর বলে তুমি সাধনার পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

রুদ্রকের কাছে যোগশিক্ষা করতে লাগলেন সিদ্ধার্থ। তাঁর একাগ্রতা দেখে চমৎকৃত হলেন রুদ্রক। এখানেই তাঁর বহুদিন কেটে গেল, যোগবিদ্যা অনেকটা আয়ত্ত হল তাঁর। শিষ্যও হল তাঁর পাঁচজন।

কিন্তু আরও কঠোর যোগসাধনার দিকে গেল তাঁর মন।
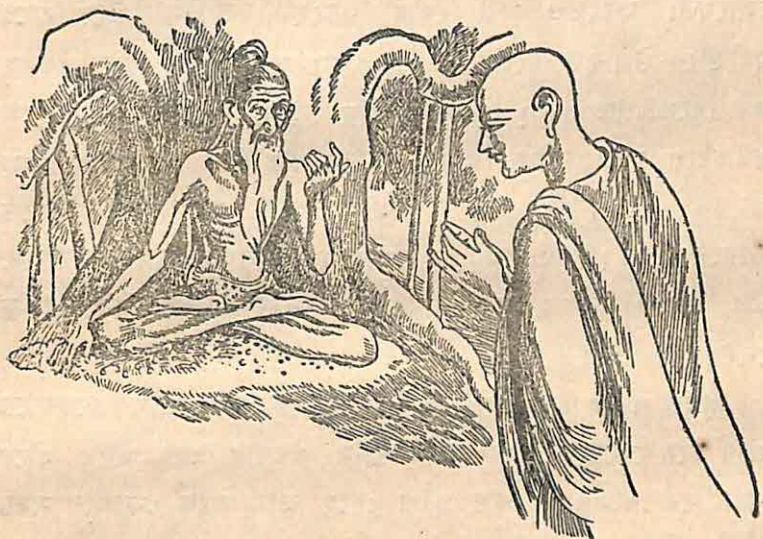
এবার রুদ্রকের আশ্রম ছেড়ে নৈরঞ্জনার তটে তিনি নির্জনে কঠোরতর যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত তাঁর মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেল। তিনি কিছুতেই বিচলিত হলেন না। কঠিন যোগাভ্যাসে শরীর হয়ে গেল শীর্ণ। রুদ্রকের কাছে

শেখা আস্ফানক ধ্যানে তিনি নিমগ্ন থাকতেন। শরীরকে কৃচ্ছ্রসাধনে নিযুক্ত রেখে অর্থাৎ কষ্ট দিয়ে তিনি যোগচর্চা করতে লাগলেন। শেষে এমন আহার সংযত করলেন যাতে প্রতিদিন একটিমাত্র চাল খেতে হত তাঁকে।

এমনি করে ছয় বৎসর কেটে গেল তাঁর। কিন্তু সাধনা নিষ্ফল হল।

এবার ধ্যান থেকে উঠলেন তিনি। কিন্তু কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনে তাঁর শরীর তখন এত দুর্বল হয়ে গেছে যে তিনি সামান্য একটু চলাফেরা করতেও কষ্ট বোধ করছেন। তিনি ধীরে ধীরে নদীতীরে উপস্থিত হলেন। মনে মনে ভাবলেন, দেহকে এরকম কষ্ট দিয়ে লাভ কি? শরীরই যদি বিকল হয়ে পড়ে তা'হলে ধর্মাচরণে আর কাজ কি? এতদিন কত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সহ্য ক'রেও ত তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারলেন না! ভগ্নমনে ও ভগ্নদেহে তিনি ভাবতে লাগলেন, এর উপায় কি হ'তে পারে? মাঝামাঝি পথ কি কিছু নেই?

সমস্ত শরীর তাঁর অপটু, শীর্ণ। পরণের কাপড়খানি একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে। তখন তিনি স্নান করবার জন্য ধীরে ধীরে নদীতীরে গেলেন। কিন্তু দুর্বল দেহে স্নান করে ফেরবার সময় তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

চৈতন্য লাভ ক'রে তিনি এবার থেকে শরীরের যত্ন করবেন স্থির করলেন। এই সময়ে উরুবিল্ব নগরের কাছে নন্দিক গ্রামের এক ধনীর মেয়ে একপাত্র পায়স নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হল। মেয়েটি বনদেবতার পূজা দিতে এসেছিল।

সিদ্ধার্থ আনন্দিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কে তুমি ভদ্রে ?

—আমি সুজাতা। আপনার জন্যেই এ পায়স এনেছি। আপনি দুর্বল, আপনি খেলেই আমার তৃপ্তি হবে।

এ যেন ভগবানের ইঙ্গিত। সিদ্ধার্থ হাত বাড়িয়ে সে পায়স
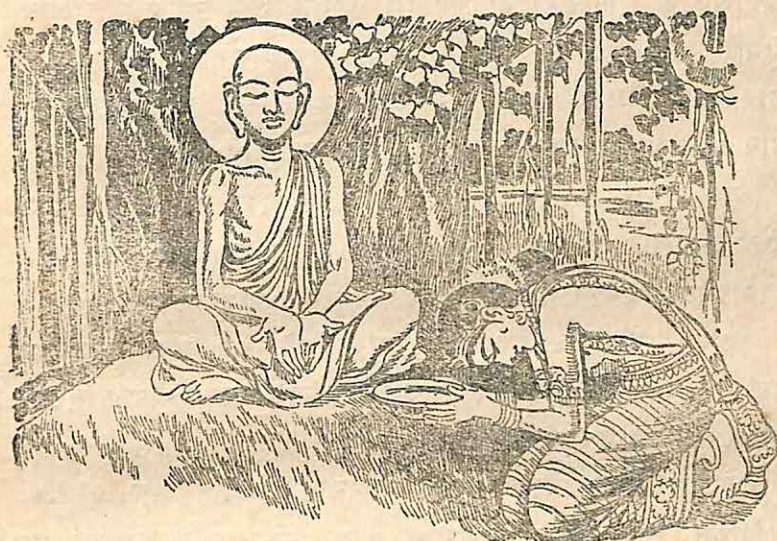
গ্রহণ করলেন ও শরীর পোষণের জন্যে তাকে সাত ভাগ করে সাতদিনের খাদ্যস্বরূপ রাখলেন।

সুজাতা কৃতার্থ হয়ে চলে গেল।

এদিকে এইসব দেখে তাঁর পঞ্চ শিষ্য ভাবলেন,—গুরুদেব বুঝি আবার সংসারের ভোগের মধ্যে ফিরে আসতে চাচ্ছেন। এরকম গুরুর শিষ্য হয়ে লাভ কি ? তার চেয়ে অন্য জায়গায় অন্য গুরুর সন্ধান করাই ভাল।

হ'লও তাই, সেই পঞ্চ শিষ্য তখন কাশীর কাছাকাছি ঋষিপত্তনে চলে গেলেন।

পঞ্চ শিষ্য চলে যাবার পর সিদ্ধার্থের মনে নানা চিন্তার উদয় হ'ল। কত কি ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এই সময় তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন।

ত্রিতন্ত্রী বীণা হাতে দেবরাজ এলেন তাঁর কাছে। বীণার তিনটি তারের একটি তার থেকে বার হচ্ছে ভয়ানক কর্কশ স্বর, আর একটি তার থেকে মোটেই কোন স্বর বার হচ্ছে না, আর একটি অর্থাৎ তৃতীয় তার থেকে মধুর স্বর বার হচ্ছে।

ঘুম ভেঙ্গে গেলে এই স্বপ্নের কি অর্থ হ'তে পারে, সেই কথা তিনি ভাবতে লাগলেন। তখন তাঁর মনে হল, ঠিকই ত! একদিকে কঠোর ভাবে দেহ শুষ্ক ক'রে তপস্যা ঐ কর্কশ স্বরের তুল্য।

সংযম নেই, ভোগবিলাসের বাধা নেই,—এ অবস্থায় তপস্যা করা নিরর্থক। ওতে কোনই ফল হবে না। তাই বীণার দ্বিতীয় তার থেকে কোন স্বরই বার হয় নি।

তৃতীয় তার থেকে মধুর স্বর বার হওয়ার অর্থ এই যে, শরীরকে সুস্থ রেখে ও মনকে শান্ত রেখে তপস্যা করলে সে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত।

এইবার বোধিদ্রুমমূলে তিনি তপস্যায় বসলেন। বুদ্ধত্ব লাভ না ক'রে তিনি ক্ষান্ত হবেন না। এইভাবে তপস্যা করতে করতে শরীরের নাশ হয় হোক।

তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥

শুষ্ক হোক্ এ আসনে শরীর আমার,
ত্বক্ অস্থি মাংস হোক বিলীন এবার।
যে বুদ্ধত্ব বহুকল্প-তপস্যার ধন,
তারে চাই, তবে যাব ছাড়ি এ আসন।

সিদ্ধার্থ বসলেন তপস্যায়।

তাঁর এ প্রতিজ্ঞা শুনে ও তপস্যা দেখে সদ্ধর্মের শত্রু "মার" খুব ভয় পেলেন। মানুষের মনোরাজ্যেই তাঁর যত কিছু প্রতাপ। পণ্ডিতেরা এই মারকেই কামদেব, চিত্রায়ুধ ও পুষ্পকার ব'লে জানেন। তিনি কামরাজ্যের রাজা আর মানুষের মনোরাজ্যের সব কিছু খবর তিনি রাখেন। তাঁর বিলাস, হর্ষ ও দর্প নামে তিন পুত্র আর রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা নামে তিন কন্যা।

মার ভাবলেন, যদি সিদ্ধার্থ মানুষকে মোক্ষপথের সন্ধান দিয়ে আমার প্রভাব বন্ধ করেন, তা'হলে আমার অস্তিত্ব জগৎ থেকে লুপ্ত হবে। যে কোন প্রকারেই হোক্, সিদ্ধার্থের তপস্যা ভেঙ্গে দিতে হবে। যতদিন না সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব পান, ততদিন আমি তাঁর মনোরাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারব। কিন্তু তিনি বুদ্ধত্ব পেলে আর পারব না। সুতরাং সিদ্ধার্থের তপস্যা ভেঙ্গে দিতে হ'লে যা কিছু করবার প্রয়োজন, এখনি তা আরম্ভ করা যাক্।

তাঁর তিন মেয়ে রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা তখন সুন্দরী তরুণীর রূপ ধ'রে সিদ্ধার্থের সামনে এসে বললেন :

"চক্রবর্ত্তিসুখং ত্যক্ত্বা কিং দীনং সুখমাশ্রয়ে।
ত্যক্ত্বা সংপৎ কথং মোক্ষ ইত্যস্মান্ সমুপাশ্রয় ॥"

তুমি রাজ-অধিরাজ, সুখ ছাড়ি' কেন আজ
এমন দীনের বেশে কাটাও জীবন ?
ত্যজিয়া সম্পদ্ সুখ কেন পেতে চাও দুখ,
কে বলে ইহাতে মোক্ষ করিবে অর্জন ?
এস আমাদের কাছে, তৃপ্ত হবে মন।

কিন্তু সিদ্ধার্থের চরিত্র-মাহাত্ম্য তাঁদের মুগ্ধ করল। তাঁরা ফিরে এসে মারকে তাঁর তপস্যা ভঙ্গের চেষ্টা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হ'তে অনেক অনুরোধ করলেন। মারের তিন পুত্র বিলাস, হর্ষ ও দর্প অনেক চেষ্টা ক'রেও সিদ্ধার্থকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারলে না। তখন স্বয়ং মার এসে উপস্থিত হলেন তাঁর সামনে। মার বললেন :

কামেশ্বরোঽস্মি বসিত্বা ইহ সর্ব্বলোকে
দেবাশ্চ দানবগণা মনুজাশ্চ তীর্য্যা।
ব্যপ্তা ময়া মম বশেন চ যান্তি সর্ব্বে
উত্তিষ্ঠ মহ্য বিষয়স্থ বচং কুরুষ্ব॥"

আমি হই কামেশ্বর, এই বিশ্ব চরাচর
দেবতা দানব নর তীর্যক্ সকলে
আমারে ছাড়ে না কভু, আমিই তাদের প্রভু,
আমি রাখি এ সংসার নিজ মায়া বলে।
ওঠ তুমি যোগিবর, শোন বাণী মনোহর,
বিষয় ভোগের সুখ লভ ধরাতলে।

সিদ্ধার্থ বলিলেন :

"কামেশ্বরোঽসি যদি ব্যক্তমনীশ্বরোঽসি
ধর্ম্মেশ্বরোঽহমপি পশ্যসি তত্ত্বতো মাম্।

কামেশ্বরোঽসি যদি দুর্গতিন প্রযাসি
প্রাপ্স্যামি বোধি চ সমস্তু পশ্যতস্তে ॥”

কামরাজ্য অধিপতি জানি তুমি মার,
কিন্তু কোথা সে সংযম হৃদয়ে তোমার?
সংযমী না হ'লে কভু প্রভুত্ব না আসে,
কোথা পাবে সে সংযম কামনা-বিলাসে?
দুর্গতি না ঘটে যদি কখনো তোমার,
লভিব বুদ্ধত্ব আমি, দেখিবে এবার।

অনেক চেষ্টা ক'রেও মার সিদ্ধার্থকে পরাজিত করতে পারলেন না, বরং নিজেই পরাজিত হলেন। জগতের কাছে উপহাসের পাত্র হয়ে তাঁর অনুতাপ উপস্থিত হ'ল। তিনি বললেন:

“দুঃখং ভয়ং ব্যসনশোকবিনাশনঞ্চ
ধিক্কারশব্দমবমানগতঞ্চ দৈন্যম্।
প্রাপ্তোঽস্মি অদ্য অপরাধ্য সুশুদ্ধসত্ত্বে
অশ্রুত্বা বাক্য মধুরং হিতমাত্মজানাম্ ॥”

শুদ্ধসত্ত্ব সিদ্ধার্থের অনিষ্টের তরে
করেছি প্রয়াস কত যাহা মনে ধরে,
পেলাম যে অপমান, দীনতা, ধিক্কার,
ব্যসন, শোকের জ্বালা, দুঃখ, ভয় আর।
কন্যাদের ভাল কথা কানে শুনি নাই,
হাতে-হাতে প্রতিফল পেলাম যে তাই!

মারকে পরাজিত ক'রে সিদ্ধার্থ যে অপূর্ব শান্তি পেলেন তাতে তাঁর চিত্ত আনন্দময় ধ্যানলোকে বিচরণ করতে লাগল। সুখদুঃখ-

বিরহিত হয়ে তাঁর চিত্ত নির্মল হ'ল। দিনের পর দিন তিনি ধ্যানপথে তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান করতে লাগলেন। শেষে একদিন তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করলেন। গয়াতীর্থে বোধিদ্রুমের নীচে তাঁর বুদ্ধত্ব লাভ হ'ল।

সেই অপূর্ব জ্ঞানের আলোকে তিনি সৃষ্টি-প্রবাহের বাইরের ও ভিতরের আসল রূপটি দেখতে পেলেন। সকল বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের মধ্যে চলেছে কোন্ অখণ্ড নিয়ম, কার্য ও কারণ সম্বন্ধের মধ্যে কাজ ক'রে চলেছে কোন্ প্রচ্ছন্ন কৌশল—আজ সে-সব দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে। অবিদ্যা অজ্ঞানের নাম। এই অজ্ঞানই সংস্কারের সৃষ্টি করে। এই সংস্কার নিয়ে মানুষ তার নিজের জগৎ সৃষ্টি করে, আর এই অজ্ঞান থেকেই মানুষ দুঃখ পায়। তাই, অবিদ্যা বা অজ্ঞান ধ্বংস করতে পারলেই দুঃখের ধ্বংস হয়। অজ্ঞান ধ্বংস হ'লেই জ্ঞান আসে। সেই জ্ঞানের আলোয় জগতে কোন্ বস্তু নিত্য আর কোন্ বস্তু অনিত্য, তা আজ তিনি বুঝতে পারলেন। নিত্য বস্তুর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে তিনি এক অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পেলেন। তাঁর কাছে সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্য, কর্ম ও অকর্ম, অনুরাগ ও বিরাগ, জন্ম ও মৃত্যু, সব এক হয়ে গেল।

ঘট, পট, মানুষ, গাছ, লতা, কীট, পতঙ্গ, প্রাণী, স্থাবর, জঙ্গম ইত্যাদির মধ্যে কোনই পার্থক্য আর রইল না। অবিদ্যা বা অজ্ঞানই সংস্কার আনে, সংস্কার থেকেই ইন্দ্রিয়-বোধ বা স্পর্শ, স্পর্শ থেকেই সুখ ও অদুঃখাসুখ এই ত্রিবিধ বেদনা, বেদনা থেকেই তৃষ্ণা, তৃষ্ণা থেকেই উপাদান বা কর্মের উৎপত্তি, কর্ম

থেকেই ধর্মাধর্মের উৎপত্তি, ধর্মাধর্ম থেকেই কর্মফল, কর্মফল থেকেই জীবের জন্মলাভ, জন্মলাভ থেকেই জরা, মরণ, শোক ইত্যাদির জন্ম। তিনি দেখতে পেলেন, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই জীবের দুঃখের কারণ। অবিদ্যার ধ্বংসেই দুঃখের ধ্বংস।

জগতের দুঃখরাশির উৎপত্তি ও নিরোধের উপায় বুঝতে পেরে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ ক'রে বুদ্ধ নাম ধারণ করলেন। আজ তিনি অমৃতগামী পথের সন্ধান পেয়েছেন, মহাশান্তির কোলে নির্বাণ খুঁজে পেয়েছেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করবার পরই তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হ'ল এই উদার-গান ঃ

"অনেক জাতি সংসারং
সন্ধাবিস্সম্ অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো
দুক্খা জাতি পুনপ্‌পুনং ॥
গহকারক দিট্‌ঠোসি
পুন গেহং ন কাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা
গহকূটং বিসকিতং।
বিসংখারগতং চিত্তং
তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা ॥"

অনেক জন্ম করিলাম লাভ
এ ধরার ধূলি 'পরে,
মোর দেহ-ঘর কে গড়েছে হায়,
তৃষ্ণা যে তারি তরে।

বার বার আমি এসে চলে গেছি
কত না বেদনা সহি,'
এ ধরণীবুকে প্রতি জনমের
চলেছি যে ভার বহি'।
এই দেহ-ঘর যে গড়েছে, তারে
পেয়েছি দেখিতে আজ,
আর কি আমারে পারিবে ভুলাতে
নিয়ে দেহ-গড়া-কাজ ?
যেই দেহ-ঘর দাঁড়াইয়া ছিল
যে থামগুলির 'পরে,
তা'রে আমি আজ দিয়াছি ভাঙ্গিয়া
জ্ঞানালোকে চিরতরে।
আমার চিত্ত সংস্কারের
বন্ধন নাহি মানে,
তৃষ্ণার ক্ষয় করিয়াছি আমি,
পেয়েছি যে নির্বাণে।

বুদ্ধত্বলাভের কিছুদিন পরে চললেন তিনি বারাণসীতে। যে পঞ্চ শিষ্য তাঁর প্রথম যোগাভ্যাসের পরে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে এবার তাঁর দেখা হ'ল। তাঁরা জানতে পারলেন, ইনি বুদ্ধত্বলাভ করেছেন। তাঁদের নাম,— কোণ্ডাণ্য, বাপা, ভদ্রীয়, মহানাম ও অনবজিৎ বা অশ্বজিৎ। তাঁরা এবার বুদ্ধের চরণে পতিত হয়ে তাঁর নবধর্মে দীক্ষিত হলেন। এঁরাই বুদ্ধের প্রথম পঞ্চশিষ্য।

সারনাথে তিনি প্রথম তাঁর ধর্মচক্র প্রবর্তন করলেন। তিন মাস সারনাথে থেকে তিনি তাঁর ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন। নানা জায়গা থেকে বহুলোক এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। এবার তাঁর শিষ্য সংখ্যা হ'ল ষাট জন।

সেই বৎসর বর্ষা ঋতুর পরে তিনি চললেন উরুবিল্বে। সেখানে তখন কাশ্যপ নামে এক সর্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত বাস করতেন। তাঁরা তিন ভাই। বুদ্ধদেবের সঙ্গে তর্কে তাঁরা হেরে গেলেন। তাঁর ধর্মতত্ত্বে তাঁরা এতদূর মুগ্ধ হলেন যে, তিন ভাই-ই তাঁর
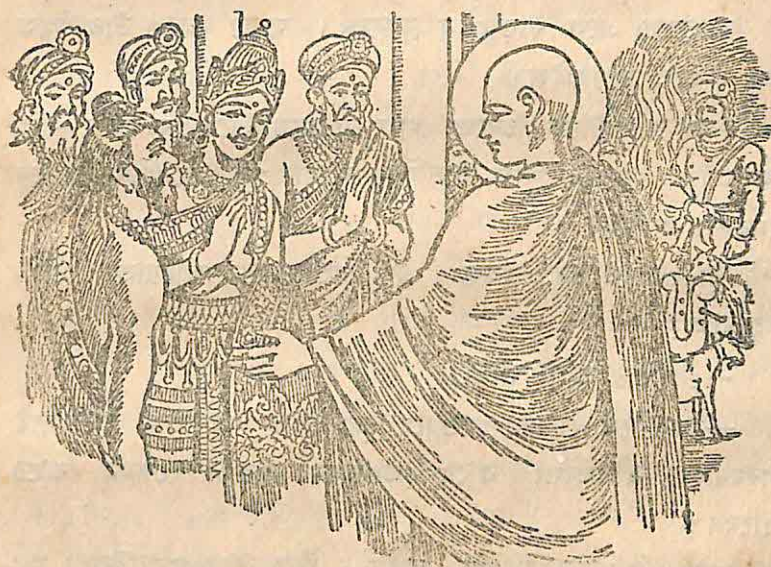
শিষ্য হলেন। পূর্বে একদিন মহারাজ বিম্বিসারকে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে, বুদ্ধত্বলাভ করবার পর তিনি রাজগৃহে মহারাজার সঙ্গে দেখা করবেন। তাই এবার তিনি চললেন রাজগৃহে।

ঘটনাচক্রে অপুত্রক বিম্বিসার সেদিন আয়োজন করেছেন পুত্রলাভের জন্য এক বিরাট যজ্ঞের। এখানে দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্যে বহু পশু বধ করা হবে। একটা প্রকাণ্ড ছাউনির ভিতরে পশুগুলিকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

বিম্বিসারের কাছে খবর গেল শান্তমূর্তি সন্ন্যাসী আসছেন রাজপ্রাসাদের দিকে। রাজা ভাবলেন, এ নিশ্চয়ই দেবতার লীলা। তাঁর যজ্ঞের সফলতার জন্যে নিশ্চয়ই এ কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব।

যজ্ঞস্থলে এসে দাঁড়ালেন বুদ্ধদেব। সমস্ত লোক তাঁর দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল।

বিম্বিসার তাঁকে চিনতে পেরে এগিয়ে এসে বললেন,—কি আশ্চর্য! আপনি আজ শুভদিনে আমার গৃহে এসেছেন, এ যেন দেবতার আশীর্বাদ !

বুদ্ধদেব বললেন,—কিন্তু এ পশুবধের আয়োজন কেন মহারাজ?

—দেবতার তৃপ্তির জন্যে।

—কে বলে দেবতা পশুবধে তৃপ্ত হন? মহারাজ, অহিংসাই পরমধর্ম। জীবহিংসা ক'রে ভগবানের কৃপা কেমন ক'রে পাবেন?

রাজা বিম্বিসার চিন্তিত হলেন। কিন্তু রাজপুরোহিতের দল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন,—কি! দেবতার যজ্ঞে পশুবধ বন্ধ হবে? এতকাল ধ'রে যে ধর্মপ্রথা এ দেশে চলে আসছে, একজন সন্ন্যাসী তাতে বাধা দেবেন?

রাজগৃহের পরিব্রাজক সঞ্জয়ের শিষ্য উপতীষ্য ও কালিত নামে

দুই শাস্ত্রজ্ঞ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ এগিয়ে এলেন বুদ্ধদেবের সামনে। কিন্তু বুদ্ধদেবের অপূর্ব ধর্মতত্ত্বে তাঁরা এতদূর মুগ্ধ হলেন যে, পরে তাঁরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এঁরাই ভবিষ্যৎকালে সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন নামে সুবিখ্যাত হয়েছিলেন। স্বয়ং রাজা বিম্বিসার ও রাজপরিবারের সকলেই তাঁর শিষ্য হলেন। রাজমহিষী মহাক্ষেমা তখন বাপের বাড়ীতে ছিলেন। তাঁর কাছেও সংবাদ গেল।

এবার বুদ্ধদেব রাজগৃহের বেণুবনে এসে কিছুদিন বাস করতে লাগলেন। এই স্থানেই সঙ্ঘ নাম দিয়ে তিনি স্থাপন করলেন তাঁর শিষ্যদের এক সমাজ। এখন থেকে তাঁরা ভিক্ষু নামে পরিচিত হলেন, আর সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন হলেন এই সঙ্ঘের প্রধান পরিচালক বা নেতা।

একদিন বুদ্ধদেব শিষ্যদের মন বোঝবার জন্যে তাঁদের মধ্য থেকে অনাথপিণ্ডদ নামে এক শিষ্যকে পাঠালেন শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা আনতে। এই অনাথপিণ্ডদ পূর্বে শ্রাবস্তীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। তাঁর অতি শিশুকালের নাম ছিল সুদত্ত। এ নাম আর কেউ জানত না। বুদ্ধদেব প্রথম দর্শনেই তাঁকে সুদত্ত নাম ধ'রে ডাকতেই তিনি তাঁর মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে পড়েন ও পরে তাঁর উপদেশ শুনে তাঁর শিষ্য হন।

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা আনতে চললেন অনাথপিণ্ডদ। ধনীদের কত রত্ন আভরণ কত মুল্যবান্ জিনিস কত সুখাদ্য তিনি ফিরিয়ে দিলেন। এ সবে প্রাণ তাঁর সাড়া দিল না। কোথায় শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা? সারাদিন এইভাবে কাটল।

শেষে এক ভিখারিণীর কাছে হাত পাততেই, সে গাছের

আড়ালে সরে গিয়ে হাত বাড়িয়ে তাঁকে দিল তার একমাত্র ছিন্ন পরিধেয় বস্ত্র।

অনাথপিণ্ডদের চোখে এল জল। এই ত পাওয়া গেছে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা।

বুদ্ধদেব অনাথপিণ্ডদের মনোভাব বুঝে খুবই সন্তুষ্ট হলেন।
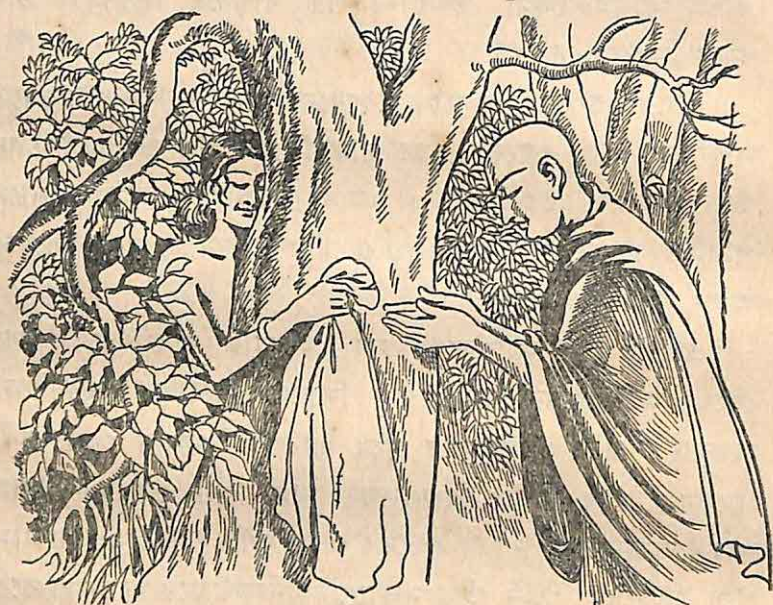
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা যার কাছ থেকে পাওয়া গেছে, তাকে খাদ্য ও বস্ত্র পাঠিয়ে দিলেন।

এই সময় অনেক নারী এগিয়ে এলেন তাঁর ধর্মের ছায়ায়। তাঁরাও সঙ্ঘের মধ্যে ভিক্ষুণী দল গড়ে তুললেন। এঁদের ধর্মভাব, এঁদের মানবকল্যাণের কাজ আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে ভারতের ইতিহাসে।

একবার শ্রাবস্তীতে এল দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। অনাথ-পিণ্ডদের মেয়ে সুপ্রিয়া দীনবেশে সেবার পথে পথে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে গেলেন তাঁর পিতার ধনী বন্ধুদের দ্বারে দ্বারে। করুণস্বরে আবেদন জানালেন দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীকে বাঁচাতে! এইভাবে তিনি শ্রাবস্তীকে রক্ষা করলেন দুর্ভিক্ষের হাত থেকে। আরও একবার তিনি এমনই হাতে নিয়েছিলেন ভিক্ষাপাত্র রাজগৃহের অরণ্যে, যখন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের খাদ্যাভাব ঘটেছিল।

এইবার চললেন বুদ্ধদেব বৈশালীর পথে। নগরের শেষপ্রান্তে এক প্রকাণ্ড আম্রবন। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তিনি সেদিনের মত আশ্রয় নিলেন সেখানে।

খবর পেয়ে নগরের শ্রেষ্ঠ রূপসী অম্বপালি এলেন বুদ্ধদেবের চরণদর্শনে। তাঁরই এই আম্রবন।

—প্রভো!

—কে তুমি ভদ্রে?

—আমি ঘৃণিতা নারী, আমাকে উদ্ধার করুন।

—আত্মশুদ্ধিই তোমার উদ্ধারের উপায়।

—আমার সে আত্মশুদ্ধি কি করে হবে প্রভো?

বুদ্ধদেব প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন:

সর্বপাপস্‌স অকরণং কুসলস্‌স উপসম্পদা
সচিত্তপরিয়োদপনং এতং বুদ্ধানসাসনং ॥

সর্ব পাপকর্ম হ'তে হইও বিরত,
কুশল কর্মের সদা করো আচরণ,
চিত্ত তব পরিশুদ্ধ করিও নিয়ত,
জানিও বুদ্ধের হয় এ অনুশাসন।

অম্বপালি তখন নিজের সমস্ত ধনসম্পত্তি দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে বুদ্ধদেবের চরণে আশ্রয় নিলেন। তাঁর আম্রবনও বুদ্ধদেবের চরণে অর্পণ করলেন।

একদিন অম্বপালির রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বৈশালীতে ; আজ তার সর্বস্বত্যাগের মহিমা ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে।

এবার বুদ্ধদেব চললেন শ্রাবস্তীর দিকে। দলে দলে কত লোক তাঁর আগমনবার্তা শুনে ছুটে এল তাঁর কাছে। তিনি তাঁর ধর্মের মর্ম বুঝিয়ে দিলেন তাদের।

পরদিন খুব ভোর বেলায় তিনি বসে আছেন নির্জনে নদীতীরে। অদূরে শ্রাবস্তী নগরী তখনো যেন ঘুমিয়ে আছে। শুধু পূবদিকে ঈষৎ উষার আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ তাঁর সামনে মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে এলেন এক নারী।

—কে তুমি? এত ভোরে এসেছ কেন আমার কাছে?—স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন বুদ্ধদেব।

—আমি কিসা গৌতমী। আপনি শুনেছি স্বয়ং ভগবান্। আমার এই মরা ছেলেকে বাঁচিয়ে দিন প্রভু!

—এ ত সম্ভব নয় গৌতমী। নশ্বর জীব-জগতের এই নিয়ম। জন্ম হ'লেই মৃত্যু হবে।

—বাছা আমার কালও মা বলে ডেকেছে। কালও আমার গলা জড়িয়ে কত কথা বলেছে। একে হারিয়ে আমি কেমন ক'রে বাঁচব!

—কিন্তু এর কোন উপায়ই ত নেই গৌতমী।

—না প্রভো, আমি আপনার চরণ কিছুতেই ছাড়ব না। আমি

আমার মরা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ছায়ার মত আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফিরব। শুনেছি কত যোগ-শক্তি আপনার। দিন আমার ছেলেকে কৃপা করে বাঁচিয়ে।

—গৌতমী!

—কি প্রভো?

—একটা উপায় আছে, যাতে আমি তোমার ছেলেকে
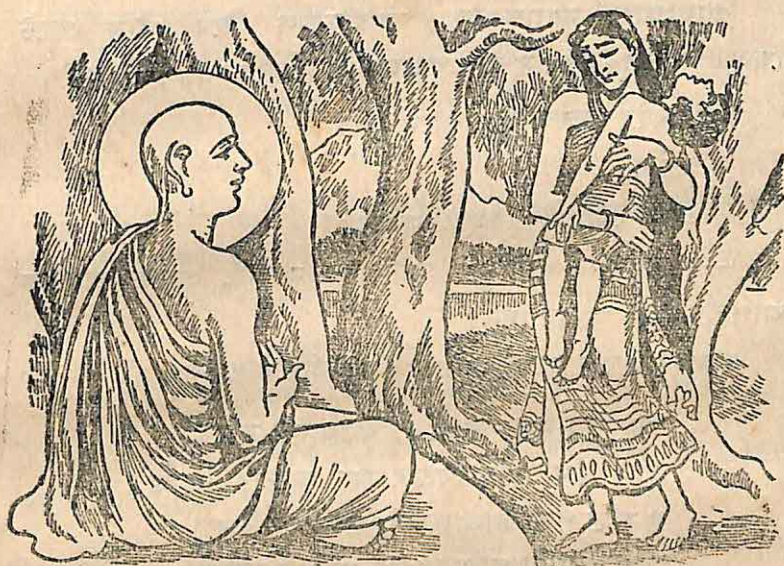
বাঁচিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তোমাকে শুধু একমুঠো সরষে আনতে হবে।

আশার আনন্দে নেচে উঠল মায়ের প্রাণ। সরষে? এ ত অতি সামান্য কথা। আমি এখনই চললাম, প্রভু। একমুঠো কেন? যত ইচ্ছা হয় সরষে নিন।

—থাম গৌতমী, শুধু তোমাকে একটি মাত্র নিয়ম পালন করতে

হবে। সরষে আনবে শুধু সেই বাড়ী থেকে কোনদিন যাদের কেউ কখনো মরে নি।

গৌতমী ভাবলেন, এ এমন কি শক্ত কাজ! এত বড় শ্রাবস্তী নগর, কতলোকের বাস এখানে। কিসা গৌতমী তাঁর মরা ছেলেকে বুকে ক'রে তখনি চলে গেলেন নগরের দিকে।

বুদ্ধদেব স্থির হয়ে ব'সে রইলেন সেই নদীতীরে।

প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, অপরাহ্নকাল ধীরে ধীরে কেটে গেল। বুদ্ধদেব তেমনি বসে আছেন। সন্ধ্যার আর দেরী নেই।

হঠাৎ কার পদশব্দ তাঁর কানে এল।

—প্রভো!

—এনেছ গৌতমী একমুঠো সরষে?

—না, কোথাও পাইনি। আমি সব বুঝেছি, এবার আমাকে আপনার চরণে আশ্রয় দিন।

বুদ্ধদেব তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

"তং পুত্ত-পসু-সম্মত্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।
সুত্তং গামং মহোঘোহব মচ্চু আদায় গচ্ছতি॥
ন সন্তি পুত্তা তানায় ন পিতা ন পি বন্ধবা।
অন্তকেনাধিপন্নস্স নত্থি ঞাতিসু তণতা॥
এতমত্থবসং ঞত্বা পণ্ডিতো সীলসংবুতো।
নির্ব্বাণগমনং মগ্গং খিপ্পমেব বিসোধয়ে॥"

যেমন প্রবল বন্যা হঠাৎ আসিয়া
ঘুমন্ত পল্লীরে লয় স্রোতে ভাসাইয়া,
সেইরূপ সংসারের মায়ামুগ্ধ নরে
মৃত্যু আসি লয়ে যায় আপন বিবরে।

পুত্র, পিতা, মিতা, কেউ করে না'ক ত্রাণ,
জ্ঞাতিরাও নাহি করে কোন বাধা দান;
শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানিগণ এই তত্ত্ব বুঝে
নির্বাণের পথখানি শুধু লয় খুঁজে।

মরা ছেলের সৎকার ক'রে গৌতমী বসলেন বুদ্ধদেবের চরণ-প্রান্তে।

বুদ্ধদেব বললেন,—বল গৌতমী,

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

কিসা গৌতমীর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। তিনি গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললেন,—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

কিসা গৌতমীর অন্তর হ'তে শোকের কালো ছায়া সরে গিয়ে ফুটে উঠল শান্তির আলো।

বুদ্ধদেব কিসা গৌতমীকে ভিক্ষুণী করে নিলেন। তিনি এবার চললেন জন্মভূমি কপিলবাস্তুর উদ্দেশে।

পথে যেতে যেতে তিনি একটা গ্রামের প্রান্তে পৌঁছলেন। গ্রামের নাম অলাকী। একদিকে ধূ ধূ করছে প্রান্তর আর শ্মশান, অন্যদিকে নীচজাতের দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকদের বাসভূমি এই অলাকী গ্রাম।

এইসব লোকের একটা প্রকাণ্ড দল বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা

ক'রে বললে,—তোমাকে দেখতে সাধুর মত। কিন্তু আমরা তোমার চেহারায় ভুলছি না। আমরা তোমাকে যা প্রশ্ন করব, তার উত্তর যদি আমাদের মনোমত হয়, তবেই তোমাকে ছেড়ে দেব, নইলে তোমাকে উচিত সাজা দেব।

মধুর হাসি হেসে বুদ্ধদেব বললেন,—তোমাদের প্রশ্ন কি বল।

দলের সর্দার এগিয়ে এসে বললে,—আচ্ছা, বল ত, এ সংসারে শ্রেষ্ঠ ধন কি? কিসে মানুষ সুখী হয়? সবচেয়ে সুস্বাদু জিনিস কি? আর কার জীবন সবচেয়ে ভাল?

বুদ্ধদেব বললেন, বিশ্বাসের চেয়ে বড় ধন আর নেই। ধর্মপথে থাকলে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। সত্যই সবচেয়ে সুস্বাদু। আর, যারা জ্ঞানী, তাদের জীবনই শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধদেবের কথাগুলি তাদের অন্তরে একটা নূতন আলো জ্বেলে দিলে। তারা এ সব কথা কোনদিন ভাল ক'রে ভেবে দেখে নি। আজ বুদ্ধদেবের কথা শুনে তারা বুঝতে পারলে, ইনি সাধারণ লোক নন। তারপর তারা তাঁর ধর্মোপদেশের মধ্যে প্রেম ও শান্তির বাণী শুনে সব ছেড়ে দিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে।

এইবার বুদ্ধদেব কপিলবাস্তুর পথে অগ্রসর হলেন!

তিনি আসছেন শুনে কপিলবাস্তুর আবালবৃদ্ধবনিতা যেন আনন্দে পাগল হয়ে উঠল। রোহিণীতীরে ন্যগ্রোধ বনের দিকে রাজ্যশুদ্ধ লোক ছুটে চলল দূর থেকে বুদ্ধদেবকে দেখবার জন্যে। তিনি কিন্তু রাজপ্রাসাদের দিকে গেলেন না। সেই ন্যগ্রোধ বনেই অবস্থান করতে লাগলেন।

সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন, এ কথা আগেই মহারাজ শুদ্ধোদনের কানে গিয়েছিল, তাই তিনি তাঁকে স্বরাজ্যে ফিরিয়ে আনবার জন্যে ক্রমে ক্রমে নয়জন লোককে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেই নয়জন লোক বুদ্ধদেবের ধর্মোপদেশে এতদূর মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁরা সংসারের সব আকর্ষণ ছেড়ে তাঁর কাছেই রয়ে গেলেন তাঁর ভিক্ষুদলে যোগ দিয়ে।

শেষবার রাজা শুদ্ধোদন পাঠিয়েছিলেন উদায়িনকে। তিনি অনেক কষ্টে বুদ্ধদেবকে রাজী করিয়েছিলেন একটিবার কপিলবাস্তুতে পদার্পণ করতে। এবার বুদ্ধদেব ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে নগরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে নগরবাসীদের চোখের জল আর বারণ মানে না! আজ বহুদিন পরে তাঁদের কত আদরের যুবরাজ সিদ্ধার্থ আবার ফিরে এসেছেন। দেহ থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে, মুখে প্রসন্ন হাসি! তাঁর শুধু এক কথা—দাও, ভিক্ষা দাও—

রাজপ্রাসাদের অলিন্দ থেকে গোপাও এ দৃশ্য দেখছিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে তখন অবিরলধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছে। আজ কতদিন পরে তাঁর হৃদয়ের দেবতা ফিরে এসেছেন, দেখে দেখে সাধ যেন আর মিটছে না।

রাহুল ছুটে এসে মায়ের আঁচল চেপে ধরল, মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করল,—মা, বাবা কি সত্যি ফিরে এসেছেন? বাবা কৈ মা?—সাত বছরের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে' বুদ্ধদেবের দিকে আঙুল দেখিয়ে গোপা বললেন,—ঐ যে বাবা উনি।

—আচ্ছা মা, বাবার হাতে ভিক্ষা পাত্র কেন? বাবা কি

ভিখারী মা? আমি বাবার কাছে যাব। তুমি যাবে না মা?

—যাব বৈ কি বাবা!

এদিকে বৃদ্ধ শুদ্ধোদন বুদ্ধদেবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত থেকে ভিক্ষাপাত্র কেড়ে নিলেন। না, না, রাজার দুলালের হাতে ভিক্ষাপাত্র শোভা পায় না। এ দৃশ্য দেখা যায় না, এ যে অসহ্য!

—সিদ্ধার্থ!

—পিতা!

—আজ তুমি ফিরে এসেছ, কত আনন্দ আমার, কিন্তু তোমার এ বেশ কেন? হাতে ভিক্ষাপাত্র কেন? তুমি কি মনে কর বৎস, আমি তোমার শিষ্যদের খাদ্য যোগাতে পারব না? তোমাকে ভিক্ষা করতে হবে?

—মহারাজ, এখন আমার ধর্মই এই।

—রাজবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা ত কোনদিন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন নি বৎস। এ ত তোমার ধর্ম নয়।

—এখন আমার বংশ রাজবংশ নয় পিতা। আমি ভিক্ষু, ভিক্ষাই আমার অবলম্বন। আমার মনের মধ্যে যে সকল রত্নের সন্ধান পেয়েছি তারই উপহার আজ দিতে এসেছি আপনার কাছে।

"উত্তিট্‌ঠে ন প্‌পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ॥
ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং দুচ্চরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ॥"
ওঠ, কেন রবে বৃথা অলসতা-বুকে,
সৎ-ধর্মের কর শুধু আচরণ,

ইহলোকে আর পরলোকে রয় সুখে
সৎ-ধর্মের-সেবা করে যেইজন।
অসৎ-ধর্ম জড়াবে তোমায় দুখে,
শুধুই বাড়াবে বেদনার বন্ধন,
ইহলোকে আর পরলোকে রয় সুখে
সৎ-ধর্মের সেবা করে যেইজন।

শুদ্ধোদন এবার বুদ্ধদেবের হাত দুটি ধরে তাঁকে নিয়ে গেলেন অন্তঃপুরে।

রাজপরিবারের সকলে ছলছল-চোখে চেয়ে আছেন বুদ্ধদেবের দিকে। এ যেন এক স্বর্গীয় দৃশ্য দেখছেন তাঁরা।

গৌতমী এসে দাঁড়ালেন বুদ্ধদেবের সামনে। তাঁর চোখ দিয়ে তখন আনন্দে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল। বুদ্ধদেব প্রশান্ত স্বরে বললেন: মা, আমি আজ ভিক্ষুক, ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে আবার কপিলবাস্তুতে ফিরে এসেছি। ভিক্ষা দাও—

—কি ভিক্ষা দেব তোমায় বৎস?

—তোমার মন। যে মন বিশ্বের কল্যাণ কামনা করে। এ মনের ত পরিমাণ নেই, গণ্ডী নেই, বন্ধন নেই, সর্বভূতে তার প্রসার।

"মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা এক পুত্তমনুরক্খে এবম্‌পি সর্বভূতেষু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।"

একটি তনয় যাঁর সে জননী বার বার
নিজ আয়ু দিয়া তারে করেন রক্ষণ,
মানস অপরিমাণ সর্বভূতে করি দান
সবারে করুক রক্ষা মানব তেমন।

গৌতমী এবার আবেগে কেঁদে ফেললেন।

রাজা শুদ্ধোদনের নির্দেশে বুদ্ধদেব প্রবেশ করলেন গোপার কক্ষে।

—গোপা !

কি স্নিগ্ধ সে স্বর ! সমস্ত প্রাণমন যেন জুড়িয়ে গেল গোপার। গোপা তখন দীনবেশে ঘরের মেঝেতে শুয়ে কাঁদছিলেন। এ স্বর কানে যেতেই তিনি ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। বহুদিন পরে আজ স্বামীর মুখের দিকে সজলচোখে চাইলেন।

স্নিগ্ধ হাসি হেসে বুদ্ধদেব বললেন,—গোপা, ভিক্ষা দাও আমাকে।

আবার চোখে জলের ধারা নামল। বুদ্ধদেবের চরণে পতিত হয়ে গোপা বললেন—কি ভিক্ষা আর দেব প্রভো, আমার সব ত তোমার পায়ে উজাড় করে দিয়েছি। শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে তুমিই ত ছিলে আমার ধ্যান-জ্ঞান, আমার ইহকাল-পরকাল !

এই সময়ে রাহুল এসে গোপার পাশে দাঁড়ালেন। গোপা বললেন : প্রভো, এই তোমার সেই রাহুল।

বুদ্ধদেব পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন। সে আশীর্বাদ যেন সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল কল্যাণ কামনায়।

"সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু
অবেরা হোন্তু
অব্যাপজঝা হোন্তু
সুখী অত্তানাং পরিহন্তু
সব্বে সত্তা মা যথালদ্ধ সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।"

সর্বপ্রাণী হোক্ সুখী, হোক্ শত্রুহীন,
অন্তরে অহিংসা যেন রয় চিরদিন।

নিজ নিজ যথালব্ধ সম্পত্তি হইতে
বঞ্চিত না হয় যেন কেহ পৃথিবীতে।

রাহুল বুদ্ধদেবকে প্রণাম ক'রে মায়ের পাশে থেকে তাঁকে একদৃষ্টে দেখতে লাগলেন। পুত্র-মুখদর্শনে বুদ্ধদেবের কোন ভাবান্তর হ'ল না।

গোপা তখন রাহুলকে বললেন, বৎস, আজ বহুদিন পরে তোমার পিতা এসেছেন, তুমি তাঁর কাছে পিতৃধন প্রার্থনা কর।

রাহুল এগিয়ে গেলেন বুদ্ধদেবের কাছে। সরল ভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন :

—পিতা, আমাকে আমার পিতৃধন দিন।

বুদ্ধদেব মৃদু হেসে বললেন, বৎস, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে, আমি তোমাকে পিতৃধন দেব। তুমি যখন-ইচ্ছা ন্যগ্রোধ বনে আমার কাছে গিয়ে পিতৃধন নিয়ে এসো।

এদিকে বুদ্ধদেবের বৈমাত্রভাই নন্দ তাঁকে বললেন, দাদা, আপনার কথা শুনে আমার মনে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মেছে। আমার বিয়ের জন্যে আগ্রহভরে সারা কপিলবাস্তু আনন্দে মগ্ন। কিন্তু আজ আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এ নশ্বর জগতে সবই অসার, সার শুধু সত্যধর্ম। আমি আর বিয়ে করব না, আমাকে আপনার সত্যধর্ম দিন।

বুদ্ধদেব নন্দকে আলিঙ্গন ক'রে তাঁকে ভিক্ষাপাত্র দান করলেন।

রাজপুরীর সকলেই ক্রমে ক্রমে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন অর্থাৎ নবধর্মে দীক্ষিত হলেন। বাকী রইলেন শুধু রাহুল। পরদিন সকালবেলাতেই রাহুল গেলেন ন্যগ্রোধ বনে।

সকালের সোনার-বরণ রৌদ্রে বুদ্ধদেব বসে ছিলেন ভিক্ষুদলের

মাঝখানে। রাহুল এসে সেখানে প্রণাম জানালেন বুদ্ধের শ্রীচরণে।

বুদ্ধদেব তাঁকে দেখে মৃদু হাস্য করলেন। তারপর বললেন, হে কিশোর পুত্র, তুমি কাল আমার কাছে পিতৃধন প্রার্থনা করেছিলে, আজ সেই পিতৃধন তোমাকে দান করব।

রাহুলকে দেখিয়ে তিনি তখন সারিপুত্রকে বললেন সারিপুত্র, তুমি রাহুলকে প্রব্রজ্যা দান কর।

বুদ্ধদেবের আদেশে রাহুলের মস্তক মুণ্ডন করে হল্‌দে রংয়ের কাপড় পরানো হ'ল। সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীর সামনে নিয়ে গিয়ে সারিপুত্র এবার তাঁকে তাঁদের চরণ-বন্দনা করতে বললেন। রাহুল সকলের চরণ বন্দনা শেষ ক'রে বুদ্ধদেবের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

প্রভাত-রবির স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়েছে তখন মুণ্ডিতমস্তক রাহুলের সারাদেহে। কিশোর মুখখানি আনন্দে উজ্জল।

তিনি একদৃষ্টে চেয়ে আছেন বুদ্ধদেবের মুখের দিকে। সমস্ত ন্যগ্রোধ বনে অপূর্ব নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। সারিপুত্র তখন রাহুলকে বললেন, বল,—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

রাহুলের কিশোর কণ্ঠে তিন বার উচ্চারিত হো'ল ঃ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

সেই মুহূর্তে সমগ্র ন্যগ্রোধ বন মুখরিত ক'রে সমবেত ভিক্ষুগণের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল ঃ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।
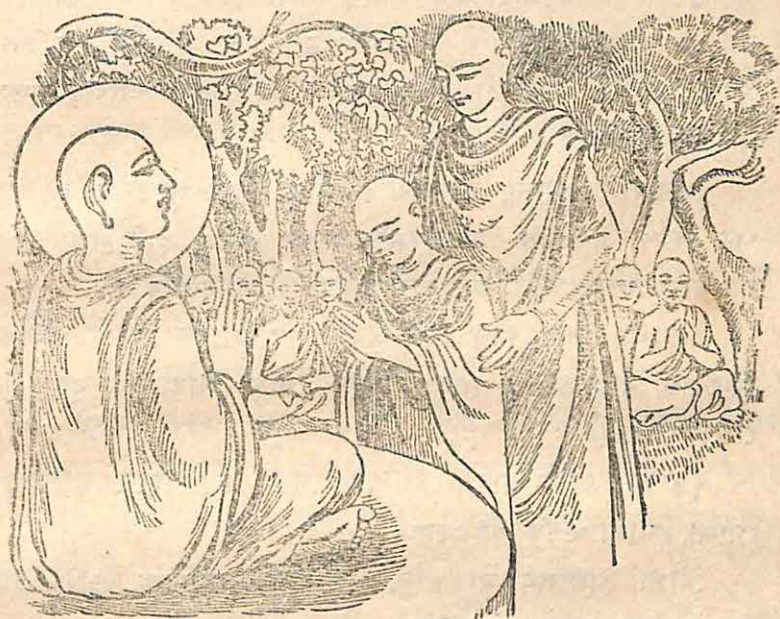
রাহুল বুদ্ধদেবের চরণে প্রণাম করলেন। তিনিও রাহুলকে বক্ষে ধারণ ক'রে বললেন বৎস, এই তোমার পিতৃধন।

পরক্ষণেই একখানি রথ এসে থামল ন্যগ্রোধ বনের ধারে। রথ থেকে নামলেন মহারাজ শুদ্ধোদন, মহারাণী গৌতমী ও গোপা।

শুদ্ধোদন এগিয়ে এসে রাহুলকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর বুকে,

তারপর বুদ্ধদেবের দিকে ফিরে ছলছল চোখে বললেন, একি করেছ তুমি বৎস, সাত বছরের ছেলেকে করলে সন্ন্যাসী ?

গৌতমী ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, আমার নন্দকে সংসারী হ'তে দিলে না, শিশু রাহুলকেও আজ কেড়ে নিলে !

গোপা শুধু স্তব্ধভাবে বুদ্ধদেবের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শুদ্ধোদন বললেন, আজ থেকে সাত বছর আগে তোমাকে হারিয়ে আমার বুকে যে বেদনা বজ্রের মত আঘাত করেছিল, আজ রাহুলকে সন্ন্যাসী হ'তে দেখে সেই বেদনা আবার নূতন ক'রে বুকে বাজল।

গৌতমী বললেন, সাত বছর আগে তুমি গৃহত্যাগ করবার পর গোপা এ পর্যন্ত সন্ন্যাসিনীর মতই জীবন কাটিয়েছে, শুধু রাহুলকে সে রাখত সাজিয়ে রাজপুত্রের মত মণিমুক্তায়।

রাহুলের সেই বেশই ছিল এতদিন আমাদের চোখে। আজ কিশোর রাহুলের এ সন্ন্যাস বেশ দেখে আমাদের বুক যে ফেটে যাচ্ছে !

বুদ্ধদেব এবার গোপার দিকে ফিরে মৃদু হেসে বললেন, গোপা, তোমারও কি কষ্ট হচ্ছে ?

গোপা বললেন না প্রভু, তোমার সন্তানকে তুমি এই দিয়েছ, এতে আমার দুঃখ কি ?

এবার বুদ্ধদেব মহারাণী গৌতমী ও মহারাজ শুদ্ধোদনকে করযোড়ে বললেন আপনাদের অন্তরে যদি ব্যথা দিয়ে থাকি, তবে আমাকে ক্ষমা করুন। আজ থেকে আমি এই নিয়ম করলাম, পিতামাতার অনুমতি ছাড়া কোন শিশু বা কিশোরকে আমার ভিক্ষুসঙ্ঘে আর গ্রহণ করা হবে না।

তখন শুদ্ধোদন ও গৌতমী বুদ্ধদেবকে বললেন, বৎস, তুমি জগতের কল্যাণের জন্যে যা করেছ, আমরা তার মর্ম কেমন ক'রে বুঝব। তোমার সদ্ধর্ম সমগ্র জগৎকে মুক্তির পথেই নিয়ে যাবে। আমরা সকলেই চিরদিন তোমার অনুগামী থাকব।

গোপা ধীরে ধীরে বললেন, আমাকে তোমার ভিক্ষুণীদলে স্থান দাও প্রভু।

—তথাস্তু। বুদ্ধদেব আবার স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন।

সন্ধ্যার কিছু আগে বুদ্ধদেব নদীতটে একাকী বসে আছেন। এক ভিক্ষু একব্যক্তিকে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন। দেখে মনে হ'ল অনেক দূর থেকে তিনি আসছেন।

—ইনি কে?

—ভগবন্, ইনি শ্রাবস্তী থেকে আসছেন, সেখানকার এক উদ্যানের মালী ইনি, নাম এঁর সুদাস।

—কি প্রার্থনা আমার কাছে?

সুদাস তখন নিজের উত্তরী খুলে একটি সুন্দর পদ্ম বার করলেন। বললেন, প্রভো, এটি অসময়ের পদ্ম, আপনার কাছে এনেছি। আমি দরিদ্র। ফুল বিক্রয় করেই সংসার চালাই।

—এর বিনিময়ে কি মূল্য চাও তুমি? তুমি ত এ পদ্ম ধনীর কাছে অধিক মূল্যে বিক্রয় করতে পারতে।

কেঁদে ফেললেন সুদাস। বললেন: প্রভো, এ অকাল পদ্ম বিক্রয় করতে গিয়ে দেখলাম যে-কোন দামেই লোকে কিনতে চায় শুধু আপনার পায়ে দেবার জন্যে। তাই ভাবলাম, নিজেই এ পদ্ম নিয়ে যাই। মূল্য ত আমি চাই নি প্রভু।

—তুমি দরিদ্র, মূল্য ছাড়া এ অকাল পদ্ম আমি কেমন ক'রে তোমার কাছ থেকে গ্রহণ করব?

এবার সুদাস পদ্মটি বুদ্ধদেবের চরণে রেখে তাঁর পদধুলি গ্রহণ ক'রে বললেন, এই ত মূল্য পেলাম প্রভু।

বুদ্ধদেব মধুর হাসি হেসে সুদাসকে আলিঙ্গন করলেন।

কিছুদিন ন্যগ্রোধ বনে বাস ক'রে তিনি আবার শ্রাবস্তীতে এলেন। সেখানে অনাথপিণ্ডদের জেতবনে আশ্রয় নিলেন।

রাত্রি গভীর। ভিক্ষুরা সকলে নিদ্রামগ্ন। শুধু অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধদেবের পাশে বসে আছেন। আকাশের চাঁদ ঢলে পড়েছে বনতরুর মাথায়। বন মর্মরে যেন ধ্বনিত হচ্ছে বুদ্ধের ত্রিশরণগান। বন-ফুলের মধুর সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে শান্ত বাতাসে।

হঠাৎ অতি লঘুপদশব্দ কানে এল তাঁর। চাঁদের আলোয় কার ছায়া পড়ল বনপথে।

ধীরে ধীরে একটি অপরূপ লাবণ্যবতী তরুণী এসে বুদ্ধের চরণে প্রণাম জানালেন।

—কে তুমি কন্যে?—স্নিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করলেন বুদ্ধদেব।

আমি এই নগরীর গৃহস্থ-কন্যা, নাম উৎপলবর্ণা। আমি আপনার চরণে স্থান নিতে এসেছি, কৃপা ক'রে আমাকে দীক্ষা দিন।

—এ গভীর রাত্রে একাকিনী তুমি এলে কেন কন্যে? আমার কাছে আসবার সময় ত এখন নয়।

—আমার পিতা সঙ্গে আছেন। তিনি শ্রাবস্তীরই একজন গৃহপতি।

—কোথায় তিনি?

—বাহিরে অপেক্ষা করছেন।

—অনাথপিণ্ডদ, গৃহপতিকে আমার কাছে নিয়ে এস।

অনাথপিণ্ডদ এবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন গৃহপতিকে।

বুদ্ধদেবের চরণবন্দনা করে গৃহপতি বসলেন অদূরে।

—উৎপলবর্ণা আপনার কন্যা ?

—হাঁ, ভগবন্। ঐ একটিমাত্র কন্যা আমার। ওর অপূর্ব রূপলাবণ্য দেখে নানা দেশ থেকে রাজারা ও রাজপুত্রেরা এসে ওকে বিবাহ করবার প্রস্তাব জানিয়ে আমাকে ভীত ও সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছে। আমি উৎপলবর্ণার বিবাহ দিলে অনেকেই আমার পরমশত্রু হবে,--হয়ত আমার জীবনসংশয় ঘটবে। তাই ওকে আপনার সদ্ধর্মের আশ্রয়ে এনেছি। কৃপা করে চরণে স্থান দিন।

—বেশ। কিন্তু আপনার কন্যা এক বৎসরকাল সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে আপনারই বাড়িতে। কেশ মুণ্ডন করবে, পীতবসন পরিধান করবে, কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করবে। এই এক বৎসর কাল অতীত হ'লে যদি উৎপলবর্ণা অর্হৎ পদলাভের উপযুক্ত হয়, আমি ওকে ভিক্ষুণীদলে অগ্রশাবিকারূপে গ্রহণ করব।

সম্মত হয়ে বুদ্ধদেবকে প্রণাম জানিয়ে পিতার সঙ্গে উৎপলবর্ণা চলে গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হ'ল।

বুদ্ধদেব তখন একটি বৃক্ষতলে বসে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদলকে সম্বোধন করে বললেন অর্হৎগণ, আজ আমি তোমাদের কাছে আমার দশশীলের ব্যাখ্যা করছি, তোমরা মন দিয়ে শোন :

অহিংসা আমার সদ্ধর্মের শ্রেষ্ঠ নিয়ম। হিংসা থেকে জগতে নিবিড় দুঃখ উপস্থিত হয়। জীবহিংসা মানুষের চিত্তকে পাপে ও

রক্তপাতে কলুষিত করে, সুতরাং আমার প্রথম শীল,—কখনও প্রাণিবধ করব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ কর।

পরের দ্রব্য অপহরণে পাপ-সঞ্চয় হয়। যার দ্রব্য অপহৃত হয় তারও উদ্বেগ, ক্রোধ ও প্রতিশোধস্পৃহা জন্মে, যে অপহরণ করে তারও পক্ষে লোভ, মিথ্যাকথন ও মিথ্যাচার হয়। সুতরাং আমার দ্বিতীয় শীল,—কখনও পরদ্রব্য অপহরণ করব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ কর।

ব্যভিচারে চিত্ত ও সমাজ কলুষিত হয়। এতে পাপ, নিন্দা, উৎপীড়ন, মিথ্যাচার ও ছলনা আসে। সুতরাং আমার তৃতীয় শীল,—কখনও ব্যভিচার করব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ কর।

মিথ্যাকথা বললে পাপ হয়, আর যে মিথ্যা বলে সেও যেমন সুখী হয় না, যার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলা হয় সেও তেমনি সুখী হ'তে পারে না। তাছাড়া মিথ্যাবাদীকে কেউ কখনও বিশ্বাস করে না। এতে মানুষ নিজের ও সমাজের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। সুতরাং আমার চতুর্থ শীল,—কখনও মিথ্যা কথা বলব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ কর।

মদ্যপানে মানসিক বিকার উপস্থিত হয়, চিত্তের স্থিরতা থাকে না। হিতাহিত বিবেচনা শক্তি লোপ পায়। মত্ততা উপস্থিত হ'লে মানুষ কোনও কুকার্যেই বিরত থাকে না। মদ্যপানে মানুষ ঘৃণিত ও হেয় হয়ে পড়ে। সুতরাং আমার পঞ্চম শীল,—কখনও মদ্যপান করব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ কর।

অপরাহ্নে ভোজন করলে একদিকে শরীরের যেমন অনিষ্ট হয়, অন্যদিকে আলস্য এসে কর্মশক্তি হ্রাস ক'রে দেয়। শরীর রক্ষার দিক দিয়ে অপরাহ্নে ভোজন সর্বদা বর্জনীয়। সুতরাং আমার

ষষ্ঠ শীল,—কখনও অপরাহ্নে ভোজন করব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ কর।

নৃত্যগীত-বাদ্য-উৎসব প্রভৃতি ব্যসনের অন্তর্গত। এসব শুনলে বা
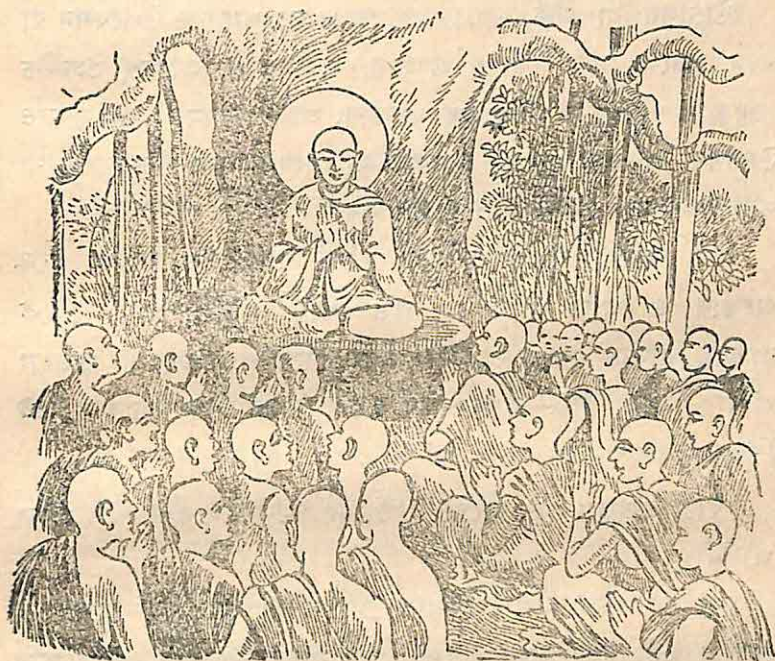
দেখলে চিত্তে মোহ উপস্থিত হয়। মোহ থেকে পাপ জন্মে। মানুষের মনে পাপজনিত নানা কল্পনার আবির্ভাব হয়। তাতে চিত্ত কলুষিত হবার সম্ভাবনা। সুতরাং আমার সপ্তম শীল,—কখনও নৃত্যগীত-বাদ্য-উৎসবাদি দেখব না বা শুনব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ কর।

সাজসজ্জার জন্য ফুলের মালা ধারণ বা কস্তুরী-চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য অঙ্গে লেপন করলে চিত্তে মোহ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা। মোহ থেকে কাম ও কাম থেকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা জন্মাতে

পারে। এতে চিত্ত কলুষিত হয়। সুতরাং আমার অষ্টম শীল,—কখনও বিভূষণের জন্যে মাল্য-ধারণ বা অঙ্গে গন্ধ-বিলেপন করব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ কর।

উচ্চাসন বা উচ্চ শয্যা, মহাসন ও মহাশয্যাতে উপবেশন বা শয়ন করলে মনে অকারণ অহঙ্কার, শরীরতৃপ্তি, আলস্য, উচ্চনীচ ভেদজ্ঞান ও মোহ উপস্থিত হয়। সুতরাং আমার নবম শীল,—কখনও উচ্চাসন বা উচ্চ শয্যা, মহাসন বা মহাশয্যাতে উপবেশন বা শয়ন করব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ কর।

অর্থ অনর্থের মূল। স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করলে মনে অহঙ্কার ও লোভ আসে। লোভ থেকে অতৃপ্তি, অতৃপ্তি থেকে বাসনা, বাসনা থেকে কাম এবং কাম থেকে পাপ জন্মে। সুতরাং আমার দশম শীল,—কখনও স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ কর।

যাঁরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন তাঁদের পক্ষে এই দশটি শীল সর্বদা পালনীয়।

বাইরে অল্প কোলাহল শোনা গেল। একজন ভিক্ষু এসে খবর দিলেন ধনী শ্রেষ্ঠিপুত্র উগ্রসেন আপনার চরণদর্শনে আসছেন। তাঁর পশ্চাতে, সঙ্গে ও সম্মুখে বহুলোক নানাদ্রব্য বহন করে নিয়ে আসছে।

এই সময়ে উগ্রসেন এসে বুদ্ধদেবের চরণ বন্দনা করলেন।

বুদ্ধদেব জিজ্ঞসা করলেন—তোমার কি প্রার্থনা?

—প্রভো, আমাকে দীক্ষা দিন। অনুমতি করুন, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।

—এ কি তোমার স্থির সংকল্প?

—হাঁ প্রভু।

—তোমার সঙ্গে যে সব সুখাদ্য, সুপেয়, সুপরিচ্ছদ ও ধনরত্ন এনেছ ও সব কার জন্য?

—আপনার ভিক্ষু সঙ্ঘের সেবার জন্য।

—তাহ'লে তুমি ত প্রব্রজ্যা গ্রহণের উপযুক্ত হও নি উগ্রসেন।

—কেন প্রভু?

বুদ্ধদেব স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন, বললেন ঃ

"মুঞ্চ পুরে মুঞ্চ পচ্ছতো মজ্ঝে মুঞ্চ ভবস্স পারগূ।
সব্বত্থ বিমুত্ত মানসো ন পুনং জাতিজরং উপোইসি॥"

সম্মুখে, পশ্চাতে, মধ্যে,—আনিয়াছ যাহা,
ভবপারে যাবে যদি, ত্যাগ কর তাহা।
কে তোমার, কি তোমার, ছাড়িলে এ মায়া,
জরা মৃত্যু নাহি রবে, ধরিবে না কায়া।

উগ্রসেন বুদ্ধদেবের উপদেশের মর্ম বুঝে সমস্ত জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে দীনবেশে তাঁর চরণতলে পতিত হলেন।

এবার আর তাঁর প্রব্রজ্যা-গ্রহণে কোন বাধা রইল না।

এবার তিনি চললেন তাঁর ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদল নিয়ে রাজগৃহে। বেলা দুপুর পার হয়ে গেছে। তাঁর ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত সঙ্গীরা নিকটবর্তী এক শালবনে আশ্রয় নিয়েছেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছেন, তাঁর পশ্চাতে বহু ভিক্ষু। এক মাঠের ধারে দেখতে পেলেন এক ব্রাহ্মণকে, নাম তাঁর ভরদ্বাজ। ভরদ্বাজ তখন মাঠে নিজে লাঙল দিচ্ছিলেন কৃষি মহোৎসব উপলক্ষ্যে।

বুদ্ধদেব দাঁড়ালেন তাঁর সামনে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে।

মাঠের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বুদ্ধদেবকে দেখে প্রণাম করে এক পার্শ্বে সরে দাঁড়ালেন।

ভরদ্বাজের কিন্তু এতে রাগ হ'ল। বুদ্ধদেবের ধর্মকে সনাতন ধর্মের বিরোধী ভেবে এর আগেই তিনি বুদ্ধদেবের উপর চটেছিলেন, এখন তাঁকে সামনে পেয়ে তিনি বললেন, হে শ্রমণ (ভিক্ষু), আমি এখন কর্ষণ করছি, এর পরে বীজ বপন করব। ফসল হ'লে সেই ফসল থেকে জীবিকানির্বাহ করব। তুমিও ও-সব ভিক্ষাপাত্র ছেড়ে আমার মত ভূমিকর্ষণ আরম্ভ কর। জীবিকানির্বাহের কষ্ট থাকবে না।

বুদ্ধদেব হেসে বললেন ঃ ঠিক বলেছেন, আপনি। কিন্তু আমিও যে আপনার মতই কৃষিকার্য করি।

আশ্চর্য হয়ে ভরদ্বাজ বললেন, এ কি রকম কথা ? তোমার গরু কৈ ? লাঙল কৈ ? বীজ কৈ ? কৃষিকাজ করি বললেই হ'ল আর কি !

বুদ্ধদেব বললেন, আপনি পণ্ডিতব্যক্তি। তবে শুনুন, শ্রদ্ধাই আমার বীজ। আমি সেই বীজ মানুষের হৃদয়রূপ মাঠে বপন করি। সৎকর্মরূপ বৃষ্টি যখন হয় তখনই ঐ বীজ থেকে অঙ্কুর বার হয়। জ্ঞানরূপ লাঙল দিয়ে আমি চাষ করি। দেহ ও মনের শক্তি আমার চাষের গরু, আর ধর্মই আমার চালন-দণ্ড। অজ্ঞানরূপ আগাছা আমি যত্নে দূর করি। আর এইরকম চাষ ক'রে আমি যে শস্য লাভ করি, তার নাম নির্বাণ-ফল।

ভরদ্বাজ স্তব্ধভাবে বুদ্ধদেবের কথা শুনলেন, তারপর কি ভেবে পরমশ্রদ্ধায় তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজগৃহে। এবার তিনিও ভিক্ষুদলে যোগ দিলেন।

পাহাড়ের পাশে পাশে অনেকটা পথ হেঁটে তিনি এসে উপস্থিত হলেন বেণুবনে। মহারাজ বিম্বিসার পূর্বেই তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু রাণী মহাক্ষেমা সে সময়ে পিতৃগৃহে থাকায় তিনি তখন পর্যন্ত সে ধর্ম গ্রহণ করেন নি। কতদিন পরে রানী মহাক্ষেমা রাজগৃহে ফিরে এসেছেন, রাজা বিম্বিসার এবার তাঁর প্রব্রজ্যা-গ্রহণের সব আয়োজন করতে লাগলেন।

সবেমাত্র সকাল হয়েছে। বেণুবনের মাথায় প্রভাতরবির সোনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে অপরূপ শোভায়। বুদ্ধদেব বনপথের একপ্রান্তে পায়চারি করতে করতে ধ্যান করছেন, কণ্ঠে তাঁর ধ্বনিত হচ্ছে ভগবানের উদ্দেশ্যে রচিত স্তবগান। পাখীরাও যেন কাকলী ভুলে সে কণ্ঠধ্বনি একমনে শুনছে। বেণুবনের একদিকে দূরে দেখা যাচ্ছে রাজগৃহের সারি সারি গৃহ-চূড়া, অন্যদিকে প্রকাণ্ড দীঘির শান্ত বুকে ফুটে রয়েছে অসংখ্য শ্বেত পদ্ম।

—প্রণাম গ্রহণ করুন প্রভো!

মধুর কণ্ঠস্বরে ধ্যানের স্বর্গ থেকে ফিরে এলেন বুদ্ধদেব। চেয়ে দেখলেন, অপূর্ব সুন্দরী নারীমূর্তি তাঁর সামনে, অঙ্গে ঝলমল করছে বহুমূল্য রত্ন-আভরণ। সোনার-সূতায়-বোনা বসন তাঁর অঙ্গে। রূপে সজ্জায় সেই সুন্দর প্রভাতের মতই উজ্জ্বল একখানি অপরূপ চিত্র!

—কে তুমি মাতা?—প্রশ্ন করলেন বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেবের পদধূলি গ্রহণ করে সুন্দরী নারী উত্তর দিলেন, আমি রাজমহিষী মহাক্ষেমা।

—মহারাজ বিম্বিসার-পত্নী?—ভাল, ভাল,—শুনেছিলাম তুমি পিতৃগৃহে ছিলে। মহারাজ তোমারও প্রব্রজ্যা-গ্রহণের কথা বলছিলেন।

—না, না, প্রভো, আমার প্রব্রজ্যা-গ্রহণের সময় এখনও হয় নি। আমার স্বামীকে কেন আপনি আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন? আমার আকাঙ্ক্ষা যে মেটেনি এখনো!

—কিসের আকাঙ্ক্ষা মহাক্ষেমা?

—এই সুন্দর পৃথিবী, কত রূপ, গান, গন্ধ, ছন্দ,—কত আশা, কত সাধ,—সব কি বিলীন ক'রে দেবেন প্রভো?

—মহাক্ষেমা!

—প্রভো!

—যা নশ্বর, যা অনিত্য, যা চঞ্চল, তার জন্যে তোমার এ মায়া কেন? রূপ-যৌবন ক্ষণস্থায়ী, সত্যধর্ম অবিনশ্বর, নিত্য, স্থির। আমি তোমাকে সেই ধর্ম দান করব। তৃষ্ণা থেকে দুঃখ আসে,—মানুষ সে দুঃখ ভোগ করে—ভ্রান্ত পথে। আমি তোমাকে সত্যপথের সন্ধান দেব।

—কিন্তু তৃষ্ণাকে বন্দী রেখে সে পথে কেমন ক'রে এগিয়ে যাব প্রভো? আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেমন ক'রে দেব পথ থেকে সরিয়ে?

—দেহটাই সব নয় মহাক্ষেমা। আমি তোমাকে এমন দ্রব্যের সন্ধান দেব যাতে দেহধারণ আর করতে হবে না।—মৃদু হাসলেন বুদ্ধদেব।

—কি সে দ্রব্য প্রভো?

—প্রব্রজ্যা।

মহাক্ষেমা উদাস চোখে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। উড়ন্ত পাখীর সাদা ডানায় ঝলমল করছে প্রভাতের সোনার আলো। এই আনন্দভরা পৃথিবী, একে রাখতে হবে দূরে, একে ভুলতে হবে চিরদিন। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল রানীর বুক থেকে।

বুদ্ধদেব মৃদু হাসলেন, বললেন,—এই পাশের দীঘি থেকে একপাত্র জল আনতে পার ?—বুদ্ধদেব নিজের ভিক্ষাপাত্র দিলেন মহাক্ষেমার হাতে। মহাপুরুষের শান্ত আদেশ,—এ যেন এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সে আদেশ পালন করতে রাজমহিষী গেলেন দীঘির তটে।

দীঘির কালো জলে পড়ল রানীর মুখের ছায়া। কিন্তু একি !

কোথা থেকে এল একটা কঙ্কাল ? দেখলেন, সত্যই ত, রত্নালঙ্কার-পরা একটা বিকট কঙ্কাল যেন দীঘিতে জল নিতে এসেছে ! রানী

ভয়ে চোখ বুজলেন, তারপর জল না নিয়ে চীৎকার করে' ফিরে এলেন বুদ্ধদেবের কাছে।

—ভয় পেয়েছ মহাক্ষেমা ?

—হাঁ প্রভো, দেখেছি কঙ্কাল, একটা কঙ্কাল !

—ও কঙ্কাল ত আর কেউ নয়, তুমি নিজে।

রানীর দেহ থর থর ক'রে কাঁপছিল, তিনি বসে পড়লেন বুদ্ধদেবের চরণপ্রান্তে। বললেন,—বুঝেছি প্রভো! আমায় রক্ষা করুন, আমায় রক্ষা করুন—!

মূহূর্তমধ্যে রানী খুলে ফেললেন তাঁর মুক্তাহার, খুলে ফেললেন তাঁর হীরক-কাঁকন। বুদ্ধদেবের চরণতলে ব'সে প'ড়ে আকুলকণ্ঠে বললেন,—আমাকে উদ্ধার করুন—প্রভো !

স্নিগ্ধকণ্ঠে বুদ্ধদেব বললেন, বল—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

রানীর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল ত্রিশরণ মন্ত্র। সে মন্ত্রধ্বনি শেষ হ'তেই বনপথে আর একজনের উদাত্তকণ্ঠে বেজে উঠল সে মন্ত্র।

আভরণহীনা মহাক্ষেমা দাঁড়ালেন এবার রাজা বিম্বিসারের সামনে বেণুবনে।

বিম্বিসার বললেন, তোমার শিবিকা রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করবার পর দাসীদের কাছে জানলাম, তুমি এসেছ বেণুবনে, ভগবান বুদ্ধদেবকে প্রণাম জানাতে।

রাজার মুখের দিকে সজলচোখে চেয়ে মহাক্ষেমা বললেন,

আজ আমার সব ভুল ভেঙ্গে গেছে মহারাজ! আজ আমি পেয়েছি পরম শান্তি।

বিম্বিসার ও মহাক্ষেমা এবার বুদ্ধদেবের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। নীল অনন্ত আকাশের নীচে বেণুবনের শাখার ফাঁকে প্রভাতরবির আলো বুদ্ধের আশীর্বাদের মতই ঝরে পড়ল তাঁদের মাথায়।

রানী মহাক্ষেমার প্রব্রজ্যা-গ্রহণের পর কিছুদিন কেটে গেল। বুদ্ধদেব এবার চললেন কোশলরাজ্যের দিকে।

অনেকটা পথ, মাঝখানে আবার গহন বন। সে বনে কেউ যায় না, রাজা প্রসেনজিৎ সে বন থেকে প্রজাদের ভয় দূর করতে পারেন নি!

কিন্তু কেন সে-বনের নামে লোকে কেঁপে ওঠে? কেন সেখানে যেতে সকলে ভয় পায়?

দস্যু অঙ্গুলিমাল থাকত সে-বনে। তার গলায় থাকত মানুষের কাটা আঙ্গুলের মালা। নিষ্ঠুরতায় তার সমকক্ষ হ'তে পারে এমন দস্যু তখন আর কেউ ছিল না। পথিকের যথাসর্বস্ব ত সে লুণ্ঠন ক'রে নিতই, তা ছাড়া তাকে হত্যা ক'রে তার হাতের আঙ্গুলগুলি কেটে নিয়ে মালা ক'রে পরত গলায়।

কোশল রাজ্যে যাবার সহজ পথ ছিল এই ভীষণ বনের মধ্য দিয়ে।

ভিক্ষুরা দারুণ আতঙ্কে শিউরে উঠে বললেন, প্রভো, আপনি এ বনের মধ্য দিয়ে যাবেন না, যাবেন না।

—কেন বল ত?

—আপনি কি দস্যু অঙ্গুলিমালের কথা শোনেন নি?

—শুনেছি, কিন্তু সেও ত আমারই মত একজন মানুষ। এতে ভয় পাবার কি আছে?

শিষ্যেরা অনেক অনুরোধ উপরোধ করলেন, কেউ কেউ তাঁর পা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সঙ্কল্প থেকে একটুও টললেন না। শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেন, যদি মরতেই হয়, একসঙ্গেই না-হয় মরব।

বুদ্ধদেব তাঁদের অনেক কষ্টে ক্ষান্ত ক'রে চললেন অঙ্গুলিমালের বনের দিকে।

গভীর বন। সূর্যের আলো সহজে সে-বনে নামে না। শুধু একটা পথ সে-বনের মধ্য দিয়ে গেছে কোশলের দিকে। লোক চলাচল একেবারেই নেই। নির্জনতা ও ভীষণতার এমন মিলন আর কোথাও দেখা যায় না।

একা বুদ্ধদেব ধীরে ধীরে চলেছেন সে পথ দিয়ে। দিনের বেলাতেও সে বন প্রায় অন্ধকার। মুখে তাঁর প্রশান্ত হাসি, চোখে তাঁর করুণার ছায়া।

অনেকটা এগিয়ে গেলেন তিনি। বন আরও গভীর আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ কার তীব্র কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন তিনি :

—থাম!

তারপর সামনে এসে দাঁড়াল এক ভীষণ মূর্তি। গলায় তার রক্তাক্ত আঙ্গুলের প্রকাণ্ড মালা। চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে, হাতে চক্‌চক্ করছে খড়গ।

বুদ্ধদেব তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, আমি ত থেমেছি, তুমি এবার থাম।

—কী, এত বড় কথা! কে আমাকে বলে থামতে?

—হাঁ, আর কেন, এবার থাম, অঙ্গুলিমাল।

আশ্চর্য ত! তাকে দেখে সকলে ভয়ে কাঁপে, আর কে ইনি, যাঁর চোখে এতটুকু ভয়ের ছায়া নেই। মুখখানি মধুর হাসিতে ভরে উঠেছে।

—কথাটার মানে কি?—দাঁত কিড়মিড় করে অঙ্গুলিমাল বুদ্ধদেবের সামনে এসে দাঁড়াল।
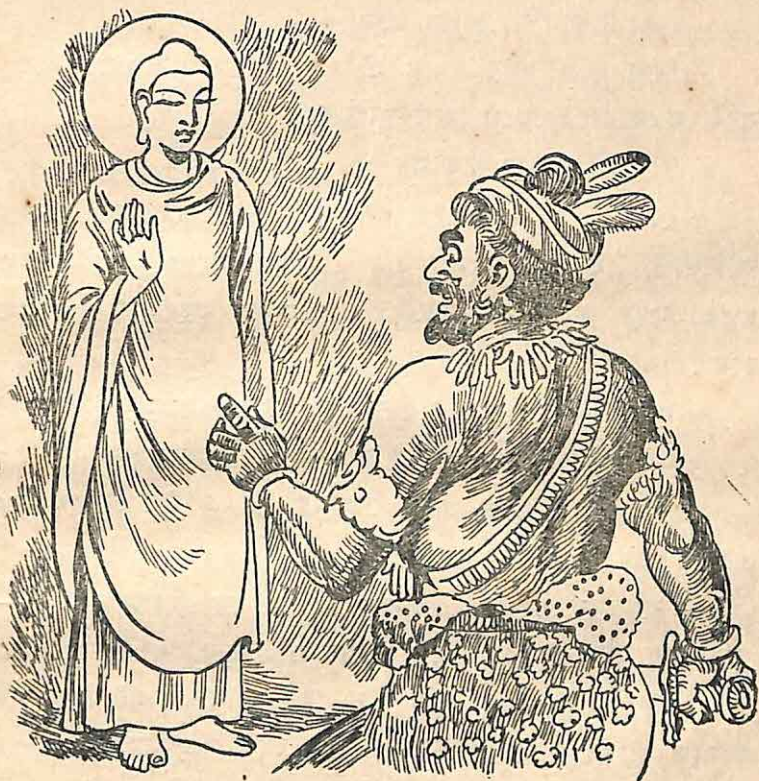
—বুঝতে পারলে না, অঙ্গুলিমাল? আমি হিংসা থেকে থেমেই আছি জগতের মঙ্গলের জন্যে, তুমি ত অনেক হিংসা করেছ, অনেক মানুষকে হত্যা করেছ, তুমি এবার থাম।

—এ সব কথা তুমি আমাকে বলতে সাহস কর, তোমার ত আস্পর্ধা কম নয়!

—এই কথাই ত আমার একমাত্র কথা, অঙ্গুলিমাল। অহিংসার চেয়ে বড় জিনিস এ পৃথিবীতে আর কিছু ত নেই। আচ্ছা বল ত, এতদিন হিংসার পথে থেকে কি লাভ করেছ তুমি?

—কেন টাকাকড়ি, কাপড়, গহনা—

—কিন্তু তুমি যখন মরবে, ঐ সব কি তোমার সঙ্গে যাবে? সবই যে তোমাকে ফেলে রেখে যেতে হবে।

—তবে কী আমার সঙ্গে যাবে?

—তোমার পাপ, যাদের রক্ত তুমি গায়ে মেখেছ, তাদের অভিশাপ, যে জীব-হিংসা তুমি এতদিন করেছ, সেই নিহত হতভাগ্যদের আর্তনাদ,—নরকে গিয়ে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তোমাকে।

—নরকে!—আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বললে অঙ্গুলিমাল।

—হাঁ, নরকে। নরক ছাড়া আর কোথাও যে তোমার স্থান নেই।

—আচ্ছা, আমাকে দেখে তোমার কি একটুও ভয় হয় নি? একটুও প্রাণ কাঁপে নি?

—ভয় হবে কেন? তোমার মধ্যেও যে ভগবান থাকেন,—তুমি শুধু হিংসার পথ ধ'রে চলেছ, তাই তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছ না। রক্ত মেখে মেখে তুমি হয়ে গেছ পাষাণ, তাই তাঁর স্পর্শ জানতে পারছ না। হিংসার এ পথ ছাড়, অঙ্গুলিমাল! তখন তাঁর কথা শুনতে পাবে, তাঁর স্পর্শ অনুভব করবে।

—তুমি ত বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছ দেখছি। সব ভাল বুঝতে পারছি না, তবুও মনটা যেন হু-হু ক'রে উঠছে। নাঃ,

তোমার ও-সব কথার যাদুতে আমি ভুলছি না। কি আছে তোমার, দাও, নইলে—

—আমার যা আছে তুমি তা নেবে ত অঙ্গুলিমাল? তবে এস, নাও আমার ভালবাসা, নাও আমার মৈত্রী (মেত্তি)।

—আশ্চর্য! আমাকে দেখছি একটুও ভয় কর না তুমি, হাসিমুখে এগিয়ে আসছ আমার দিকে। কিন্তু কেন এমন হ'ল! ামার মনের মধ্যে কে যেন বলছে—ওরে থাম্, ওরে থাম্,—

—তাহ'লে শুনতে পেয়েছ তুমি সে ডাক অঙ্গুলিমাল? এবার থামতেই হবে তোমাকে হিংসার পথে।

—যদি না থামি।

—ডাক কিন্তু বন্ধ হবে না। তোমার শয়নে স্বপনে জাগরণে ঐ ডাক তোমার পিছু নেবে। সব সময়ে তুমি আর কিছু শুনবে না, শুনবে শুধু ঐ ডাক।

—ও বাবাঃ! সত্যি বলছ তুমি?

—নিজেই কান পেতে শোন না।

—হাঁ, হাঁ, শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটাও তালে তালে ঐ কথা বলছে,—ওরে থাম্,—ওরে থাম্—। উঃ! এ যে অসহ্য! তুমি কে জানি না,—সাধু-সন্ন্যাসীর মত বেশ, কিন্তু তুমিই বল, এ ডাকের হাত থেকে আমি কেমন করে নিষ্কৃতি পাব?

—তবে এস আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—যেখানে ও-ডাক আর শুনতে পাবে না।

—সত্যি বলছ তুমি!

—আমি মিথ্যা বলি না।

—ঐ আবার! আবার! চারদিক থেকে ডাক আসছে,—আমাকে যে পাগল ক'রে দেবে! চল, তুমি যেখানে নিয়ে যেতে চাও, চল—কিন্তু এ বনের বাইরে গেলে রাজার লোক যে আমায় ধরবে।

—আমি বলছি, আর ধরবে না।

—কেন?

—তারা ধরবে দস্যু অঙ্গুলিমালকে, তোমাকে নয়।

—আমিই ত অঙ্গুলিমাল।

—একটু আগে ছিলে তাই বটে, এখন যে কানে ডাক শুনতে পেয়েছ, আর ত তুমি সে নও।

—এখন আমি তাহ'লে কি?

—এস আমার সঙ্গে। ফেলে দাও ও আঙ্গুলের মালা আর খড়গ। তুমি কে তাঁর সন্ধান আমিই বলে দেব।

—এ কি ঝড় উঠল আমার বুকের মধ্যে। আর দেরী নয়, কোথায় নিয়ে যাবে চল,—চল—

বুদ্ধদেব মৃদু হাসলেন। অঙ্গুলিমাল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল।

সন্ধ্যার কিছু আগে বুদ্ধদেব ফিরে এলেন ভিক্ষুদের মধ্যে। তাঁর সঙ্গে অঙ্গুলিমালকে দেখে সকলে শুধু যে বিস্মিত হলেন তা' নয়, বুদ্ধের মহিমায় তাঁরা স্তম্ভিত হলেন। কথা হ'ল পরদিন অঙ্গুলিমালকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধদেব শ্রাবস্তীর রাজা প্রসেনজিতের কাছে যাবেন, যাতে ওর পূর্ব অপরাধ রাজা ক্ষমা করেন।

শ্রাবস্তীর একপ্রান্তে জেতবন। সশিষ্য বুদ্ধদেব অঙ্গুলিমালকে সঙ্গে নিয়ে সেই জেতবনে উপস্থিত হলেন। পথে অঙ্গুলিমালকে

নতমস্তকে বুদ্ধের অনুসরণ করতে দেখে রাজ্যময় একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল!

শ্রাবস্তীর রাজা প্রসেনজিৎ তখন রানী বাসবক্ষত্রিয়ার বীণাবাদন শুনছিলেন। শাক্যবংশীয়া মেয়ে বাসবক্ষত্রিয়া। বুদ্ধদেবের প্রতি শুধু ভক্তি নয় একটা আত্মীয়তার টানও ছিল।

নগরের পথে জনকোলাহল শুনে প্রসেনজিৎ প্রতিহারিণীকে তার কারণ জানতে পাঠালেন। প্রতিহারিণী প্রাসাদ-অলিন্দে দাঁড়িয়ে দেখলেন, নগরবাসীরা দলে দলে জেতবনের দিকে চলেছে।

প্রসেনজিৎ তখনি রথ সজ্জিত করতে আদেশ দিলেন। রানী বাসবক্ষত্রিয়া সঙ্গে যেতে চাইলেন। কিন্তু রাজা তাতে রাজী হলেন না। তিনি তখনি রথে ছুটলেন জেতবনে। জেতবনের এক নিভৃত স্থানে উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের চরণবন্দনা করলেন তিনি।

—কি সংবাদ প্রসেনজিৎ?

—ভগবন্, আজ জেতবনে দলে দলে নগরবাসীরা আসছেন। কারণ জানবার জন্যে ছুটে এসেছি।

—আচ্ছা প্রসেনজিৎ, তোমার রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে কে বলত?

প্রসেনজিৎ একটু ভেবে বললেন, দস্যু অঙ্গুলিমাল।

—অঙ্গুলিমালকে পেলে তুমি কি কর?

—তাকে ধরা সহজ নয় ভগবন্। গহনবনে তার বাস, প্রজাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি ক'রে সে আমার রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করেছে, যার সুযোগ নিয়ে রাজা বিম্বিসার কিম্বা লিচ্ছবিরা আমার রাজ্যে আক্রমণ করতেও পারে। ব'লে দিন আপনি, আমি কেমন ক'রে অঙ্গুলিমালকে বন্দী করব।

—কিন্তু তুমি স্বীকার কর তার পূর্ব-অপরাধ মার্জনা করবে, তাকে কোন শাস্তি দেবে না ?

—ভগবন্, এ কি বলছেন আপনি ? অঙ্গুলিমাল নরহন্তা দস্যু। তার মত ভীষণ প্রকৃতির লোক আর কোথাও দেখা যায় না। তার যোগ্য শাস্তি নির্মম মৃত্যুদণ্ড।

—কিন্তু সে আগেই মরে গেছে, আর তার মৃতদেহ থেকে নূতন জীবন নিয়ে জন্মলাভ করেছে এক শান্ত ভিক্ষু।

—কোথায় সে ভগবন্ ?

বুদ্ধদেব আহ্বান করতেই অঙ্গুলিমাল এসে শান্তভাবে করজোড়ে রাজার সামনে বসল। প্রসেনজিৎ স্তম্ভিত হলেন, তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না।

অনুতপ্ত অঙ্গুলিমালকে রাজা ক্ষমা করলেন। সেও প্রব্রজ্যা-গ্রহণ ক'রে ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করল।

আরও কিছুদিন শ্রাবস্তীতে থাকবার পর বুদ্ধদেব কোশলরাজ্যে যাবার সঙ্কল্প করলেন।

একদিন সকালবেলায় তিনি শিষ্যদের মাঝখানে বসে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছেন, এমন সময় তাঁর তরুণ প্রিয় শিষ্য আনন্দ এসে সংবাদ দিল, ভগবন্, শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী পুণ্যবর্ধন সস্ত্রীক এসেছেন আপনার চরণবন্দনায়।

বুদ্ধদেব মৃদু হেসে বললেন : বেশ, তাঁদের এইখানেই নিয়ে এস।

পুণ্যবর্ধন ও তাঁর স্ত্রী বিশাখা এসে বুদ্ধচরণে প্রণাম জানালেন।

—প্রভো, আপনার কাছে একটা প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে এসেছি।

—কি প্রশ্ন ?

পুণ্যবর্ধন বললেন, প্রভো, আমার শ্বশুর সাকেত নগরের শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়। বিয়ের পরদিন আমার স্ত্রী বিশাখাকে তিনি তিনটি উপদেশ দেন—প্রথম, বাইরের আগুন ভিতরে এনো না, আর ভিতরের আগুন বাইরে নিয়ো না।

দ্বিতীয়, যে দেবে না তাকে কিছু দিও না, যে দেয় না তাকে দিও।

তৃতীয়, সুখে বসবে, সুখে খাবে, সুখে ঘুমুবে।

এর অর্থ আমি অনেক চেষ্টা ক'রে বুঝতে পারিনি। এই নিয়ে আমার স্ত্রী বিশাখার সঙ্গে আমার অনেক ঝগড়াঝাটি হয়ে গেছে।

বিশাখা বললেন, প্রভো, আমার স্বামী আমাকে ভুল বুঝে আমার উপর মিথ্যা সন্দেহ করেছেন যে, এর মধ্যে হয়ত আমার বাবার কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, বাবার এ তিনটি উপদেশের মর্ম আমি নিজেই বুঝতে পারি নি। এর মধ্যে সাধারণ অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থ নিশ্চয় আছে। আপনি ছাড়া এ গূঢ়ার্থ আর কে বলতে পারেন ?

বুদ্ধদেব মধুর হাসি হেসে বললেন, বৎসে, তোমার বাবা জ্ঞানবান্, তিনি খুব ভাল উপদেশই দিয়েছেন তোমাকে। এর প্রকৃত অর্থ এই—

প্রথম, বাইরের লোকের কোন বিবাদে যোগ দিয়ে নিজের ঘরের শান্তি নষ্ট ক'রো না, আর নিজের ঘরের কোন বিবাদের কথা বাইরে প্রচার ক'রো না।

দ্বিতীয়, যে লোক কোন জিনিস দেব ব'লে চেয়ে নিয়ে গিয়ে আর দেবে না বলে, তাকে ভবিষ্যতে আর কিছু দিও না, কিন্তু

যে লোক দরিদ্র, সে যদি কোন জিনিস চেয়ে নিয়ে গিয়ে আর না দেয়, তাহ'লেও তাকে দিও। এতে তার অভাব পূরণ করার পুণ্য হবে।

তৃতীয়, শ্বশুরবাড়ীতে সব কাজ শেষ ক'রে তবে বসবে, তাহ'লেই সুখে বসতে পাবে। সকলের শেষে খাবে, তাহ'লেই কেউ তোমার নিন্দা করবে না, সকলের শেষে শয়ন করবে, তাহ'লে কেউ আর তোমায় বিরক্ত করবে না।

পুণ্যবর্ধনের মুখে এবার হাসি ফুটে উঠল। বিশাখাও হাসিমুখে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, এতদিন ধ'রে আমাকে ভুল বুঝেছিলে, এবার ভুল ভাঙ্‌ল ত?

দু'জনে বুদ্ধদেবকে প্রণাম করলেন। বিশাখা বললেন, প্রভো, যদি কৃপা করে গ্রহণ করেন তবে শ্রাবস্তীর পূর্ব দিকে আমাদের যে উদ্যান আছে, আমি সেই উদ্যান ভিক্ষু সঙ্ঘকে দান করলাম। এই উদ্যানের নাম পূর্বারাম।

বুদ্ধদেব বললেন, জগতে অনেক সৎকাজ করবার আছে বিশাখা। তোমরা সেই সব সৎকাজ ক'রে যাও, এই আশীর্বাদ করি তোমাদের।

"যথাপি পুপ্‌ফাসিম্‌হা কয়িরা মালাগুণে বহু।
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং॥

এক ফুলে মালা নয়, এ কথা ত জানো,
মালা যদি চাও তবে বহু ফুল আনো।
বিফলে দিওনা যেতে মানব জীবন,
গাঁথ সৎ-কর্ম-মালা করিয়া যতন।

বুদ্ধদেবের একথা পালন করেছিলেন বিশাখা। দানশীলা ও

দয়াবতী ব'লে প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁর অনেক উল্লেখ আছে। শেষে এই বিশাখাই একদিন সব ত্যাগ ক'রে ভিক্ষুণী-দলে যোগ দিয়েছিলেন।

এইভাবে অনেক মহীয়সী নারী ভিক্ষুণী হয়েছিলেন। মহাপ্রজাপতী গৌতমী, গোপা, মহাক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, কিসা গৌতমী, বিশাখা, ভদ্রাকুণ্ডলকেশা প্রভৃতির নাম বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেব এবার বৈশালী হয়ে কৌশাম্বী নগরে যাবার সঙ্কল্প করলেন। সকালের দিকে যাত্রা করবার কিছু পূর্বে তাঁর সঙ্ঘে এলেন এক অপরিচিত আগন্তুক। বেশভূষা দেখে অভিজাত বংশের ব'লে বোধ হ'ল।

বুদ্ধদেবের গন্ধকুটীতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। গন্ধকুটীর দেওয়াল চন্দনকাঠের তৈরী। চারদিকে মধুর চন্দনগন্ধ। বুদ্ধদেব সেখানে আপনমনে কি যেন চিন্তা করছেন। তখন আর কেউ সে ঘরে নেই। ভিক্ষু আনন্দ একটু দূরে ঘরের বাইরে পরণের চীবরগুলি শুকোতে দিচ্ছেন।

—কে আপনি ?

—আমাকে কি চিনতে পারেন নি ভদন্ত ? আমি দেবদত্ত।

কি যেন স্মরণ ক'রে বুদ্ধদেব স্থিরভাবে চেয়ে রইলেন দেবদত্তের দিকে। সুদূর অতীতের কোন এক ডানায়-তীর-বেঁধা হাঁসের কথা মনে পড়ল তাঁর। সেদিনের প্রভাতও ছিল এমনি সুন্দর, শুধু অসুন্দর ছিল দেবদত্তের মন।

—কি অভিপ্রায় দেবদত্ত ?

—আপনার সঙ্ঘে প্রবেশ করবার জন্যে আমার চিত্ত অধীর

হয়ে উঠেছে ভদন্ত। আপনার অনুমতি পেলে আমি সব ছেড়ে চ'লে আসতে পারি।

—তার কোন প্রয়োজন নেই দেবদত্ত।

—প্রয়োজন নেই? আমি যে আপনার কাছে এসে আপনার সদ্ধর্ম গ্রহণ করতে চাই।

—তোমার সে অধিকার নেই।

—কেন এ কথা বলছেন?

—কি সংকল্প নিয়ে তুমি আজ আমার কাছে এসেছ, তা ত তুমি নিজেই জান। তোমার চোখে আমি দেখতে পাচ্ছি হিংসার ছায়া, তোমার বাণীতে শুনতে পাচ্ছি ঈর্ষ্যার গুঞ্জন।

—ভদন্ত কি আমাকে বিদ্রূপ করছেন?

—বিদ্রূপ নয় দেবদত্ত, আমি তোমার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি,—সেখানে তো এক ফোঁটা প্রেম নেই, এক ফোঁটা অমৃত নেই, শুধু গরলের প্রচ্ছন্ন ধারা বয়ে চলেছে। দেবদত্ত, সত্যি যদি কোনদিন এ পথ ছাড়তে পার, এসো, সঙ্ঘের দ্বার মুক্ত রইল তোমার কাছে।

—আমাকে এত অপমান? বেশ!

দ্রুতপদে চলে গেলেন দেবদত্ত। বুদ্ধদেব প্রশান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বাইরের আকাশের দিকে। তারপর ডাকলেন,—আনন্দ!

ভিক্ষু আনন্দ এসে নতমস্তকে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন।

বুদ্ধদেব বললেন: দেবদত্ত চলে গেলেন, আনন্দ?

—হাঁ প্রভু।

এই সময়ে অনাথপিণ্ডদ, সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন এসে গন্ধকুটীতে প্রবেশ করলেন।

অনাথপিণ্ডদ বললেন, প্রভো, নগরে একটা দুঃসংবাদ শুনে এলাম।

—কি হয়েছে অনাথপিণ্ডদ ?

—মহারাজ বিম্বিসারের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পুত্র অজাতশত্রু রাজ্যলোভে তাঁকে হত্যা করেছেন।

নির্বিকারভাবে বুদ্ধদেব চেয়ে রইলেন বাইরের দিকে। যেন কোন দুঃখ নেই, বেদনা নেই, আবেগ নেই, আকুলতা নেই। মহাসমুদ্র যেন অনন্ত বিস্তার নিয়ে সেই একই খেলা খেলছে।

বুদ্ধদেব বললেন, আমি এবার কিছুদিন রাজগৃহের গৃধ্রকূট পাহাড়ে যাব নির্জন-বাসে।

শুধু যে ভিক্ষুদের সকলের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল তা নয়, নগরের সকলেই জানলেন এ কথা।

রাত্রি গভীর। পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদের এক নিভৃত ঘরে দুটি মাত্র প্রাণী জেগে আছেন, একজন দেবদত্ত, অন্যজন পিতৃহন্তা রাজা অজাতশত্রু।

—তাহ'লে বুদ্ধ তোমাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলেন তাঁর আশ্রম জেতবন থেকে,—গম্ভীরভাবে বললেন অজাতশত্রু।

—হাঁ, মহারাজ। আমি এর প্রতিশোধ চাই।

—কি উপায়ে প্রতিশোধ নেবে ?

—শুনলাম, বুদ্ধ যাচ্ছেন গৃধ্রকূটের গুহায় নির্জন-বাস করতে। পাহাড়ের উপর থেকে যদি একখানা বড় পাথর গড়িয়ে ফেলে দিই তাঁর মাথায়, তবে সহজেই কার্যসিদ্ধি হয়।

—যুক্তি মন্দ নয় তোমার দেবদত্ত। ঐ বুদ্ধ—বুদ্ধ শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। আমি আমার রাজ্যে আদেশ

প্রচার করেছি, যে-কেউ বুদ্ধের আরাধনা, অর্চনা, স্তব, স্তুতি করবে তার একমাত্র দণ্ড মৃত্যু।

—তাহ'লে সকলেই ভয় পেয়েছে বলুন।
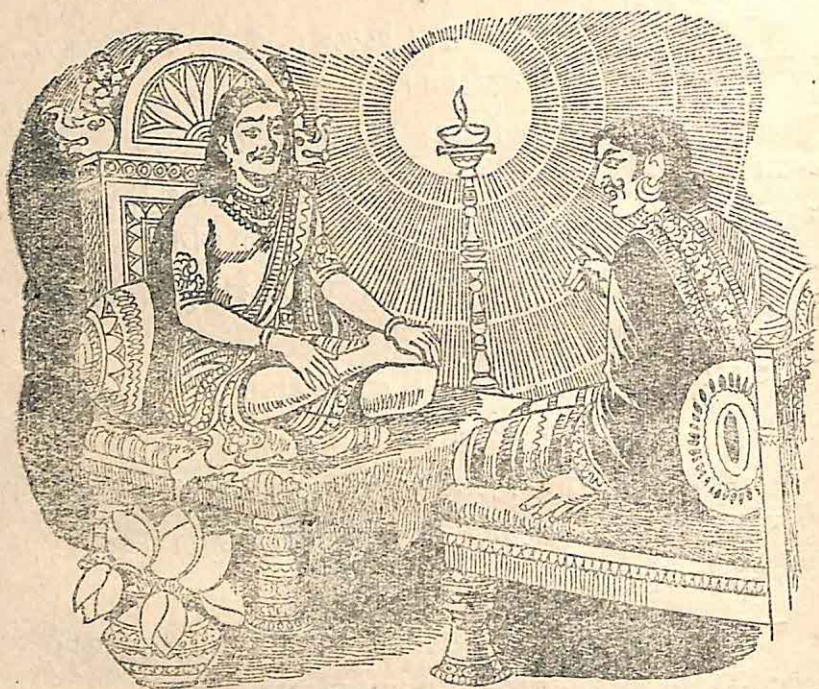
—ভয় পেয়েছে, তবে মৃত্যুও বরণ করেছে অনেকে। এই কালই সন্ধ্যায় আমার রাজপুরীতে একদাসী গোপনে বুদ্ধের উদ্দেশে দীপারতি দিতে গিয়ে রক্ষীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। তবে সে দাসী মাত্র। তার কথা কে-ই বা ভাবছে! যাক্ সে কথা, আমি সব ঠিক করে রাখব। তুমি আগে থেকেই গৃধ্রকূটে যেও।

—সে ত যেতেই হবে। আপনি শুধু জনকয়েক বলবান লোক সঙ্গে দেবেন, একখানা বড় পাথর গড়িয়ে ফেলতে হবে কিনা।

অজাতশত্রুর ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল। রাত্রি আরও বেড়ে যেতে দেবদত্ত এবার বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

গৃধ্রকূট পাহাড়ের শোভা অতি চমৎকার। নীচে পার্বত্য নদী ছোট ছোট পাথরের উপর পা ফেলে নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে। বাতাসে শাল-মহুয়ার গন্ধ। পাহাড়ের শ্রেণী চলেছে পূব থেকে পশ্চিমে। সকালের রৌদ্র ধূসর পথের অভ্রগুঁড়ায় ঝিকিমিকি ক'রে ওঠে, আবার তুপুর বেলায় হরিতকী-আমলকীর পাতার ফাঁকে দোল খায়। নির্জন পরিবেশে বুদ্ধদেব বসলেন ধ্যানে।

হঠাৎ পাহাড়ের চূড়ায় একসঙ্গে যেন শতবজ্র ডেকে উঠল। বুদ্ধদেব ঊর্ধ্বে চেয়ে দেখলেন একখানা প্রকাণ্ড কালো পাথর ভীমবেগে গড়িয়ে আসছে তাঁরই দিকে। তিন পাশে পাহাড়ের দেওয়াল। কোথায় যাবেন তিনি? আসন্ন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও তাঁর উদ্বেগহীন মুখে শান্তভাব।

পাথরখানা যেন পড়তে পড়তে আর পড়ল না। তাঁর মাথার উপরের এক পার্বত্য গাছের জটিল শিকড়ে ও তার পাশের আর একখানা বড় পাথরে আটকে গেল।

বুদ্ধদেবের প্রাণরক্ষা হ'ল। তিনি উপরের দিকে চেয়ে ক্ষণিকের জন্যে দেবদত্তের মুখখানা দেখতে পেলেন। তাঁর মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল।

সেদিনও রাত্রে অজাতশত্রুর প্রাসাদে দেবদত্ত ও অজাতশত্রু ব'সে কথা বলছিলেন।

—তাহ'লে বুদ্ধের প্রাণ বেঁচে গেল আশ্চর্যভাবে—কি বল দেবদত্ত?

—হাঁ মহারাজ, এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হ'তে পারে!

—শোন দেবদত্ত, প্রতিদিন একবার বুদ্ধ নিজে যান ভিক্ষায়। আমি সেই অবসরই খুঁজছি।

—কি বলতে চান মহারাজ?

—আমার পাগলা হাতী রত্নপালকে ত তুমি জান।

—শুনেছি অনেক কষ্টে তাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এবার বুঝেছি মহারাজ আপনার উদ্দেশ্য। অতি শুভ সংবাদ, তাতে সন্দেহ নেই।

—হ্যাঁ দেবদত্ত, সেই পাগলা হাতীই বুদ্ধের প্রাণসংহার করবে।

—কিন্তু বুদ্ধ দূর থেকে হাতীকে দেখে পালাতেও ত পারেন।

—হ্যাঁ, তা পারেন। কিন্তু তাতে ওঁর মাহাত্ম্য নষ্ট হবে। লোকে ভাববে যিনি জরা-মরণ রহিত করতে চান, তিনি নিজেই মৃত্যুভয়ে কাতর! তার ফলে বুদ্ধের এদেশে থাকা দায় হবে।

—বুঝেছি মহারাজ! কিন্তু বুদ্ধের প্রাণনাশ না হলে আমি ত শান্তি পাচ্ছি না।

—কালই এর মীমাংসা হয়ে যাবে দেবদত্ত। কুটিল হাসির রেখা ফুটে উঠল অজাতশত্রু ও দেবদত্তের মুখে।

পরদিন নগরের পথে চলেছেন বুদ্ধদেব, হাতে তাঁর ভিক্ষাপাত্র। পশ্চাতে ভিক্ষুদল।

সকলে নতমস্তকে প্রণাম জানাচ্ছেন বুদ্ধদেবকে। পথধূলিতে জলসিঞ্চন করছেন পুরনারী। সকলেই ভিক্ষা দেবার জন্যে এগিয়ে আসছেন এই মহান্ ভিক্ষুককে।

যারা ভিক্ষা দিচ্ছেন ভিক্ষু উপালি ও ভিক্ষু আনন্দ সে সব ভিক্ষা সঞ্চিত করেছেন চীবরে। বুদ্ধের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে ঃ

"দদতো পুঞ্‌ঞ্‌ং পবড্‌ঢতি সংযমতো বেরং
ন চীয়তি।
কুসলো চ জহাতি পাপকং রাগদোসমোহক্‌খয়া
স নিব্বুতো তি॥"

যারা করে দান পুণ্য তাদের বাড়িবে নিতি,
সংযত যারা পাবে নাক তারা শত্রুভীতি,
ধার্মিক যারা কোন অকুশল নাহিক হ'বে,
পাবে নির্বাণ রাগদ্বেষমোহ ছাড়িবে যবে।

হঠাৎ একটা কোলাহল উঠল—পালাও, পালাও, পাগলা হাতী, পাগলা হাতী—

প্রাণভয়ে সকলে যে যেখানে পারলেন সরে গেলেন পথ থেকে, গেলেন না শুধু বুদ্ধদেব। নির্জন পথের মাঝখানে তিনি যেমন গান গেয়ে যাচ্ছিলেন, তেমনি চললেন।

ভিক্ষুরা পায়ে ধরে অনুরোধ করলেন তাঁকে সরে যেতে। নগরবাসীরা ভয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। পুরনারীরা কেঁদে উঠলেন কিন্তু তবুও বুদ্ধদেব অটল, পথের মাঝখান দিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন ভিক্ষাপাত্র হাতে নির্বিকার চিত্তে।

সামনে ছুটে আসছে পাগলা হাতী রত্নপাল। পায়ে আধখানা ছেঁড়া লোহার শিকল, সারা গায়ে ঝরছে ঘাম। শুঁড় উঁচু করে সাক্ষাৎ প্রলয়ের রূপ ধরে সে বিদ্যুৎবেগে আসছে। এবার আর রক্ষা নেই, আতঙ্কে হাহাকার করতে করতে সকলে চোখ বুজলেন।

—তিষ্ঠ!—বুদ্ধদেবের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল শান্ত-গম্ভীর বাণী।

মুহূর্ত মধ্যে পাগলা হাতী রত্নপাল থেমে গেল বুদ্ধদেবের
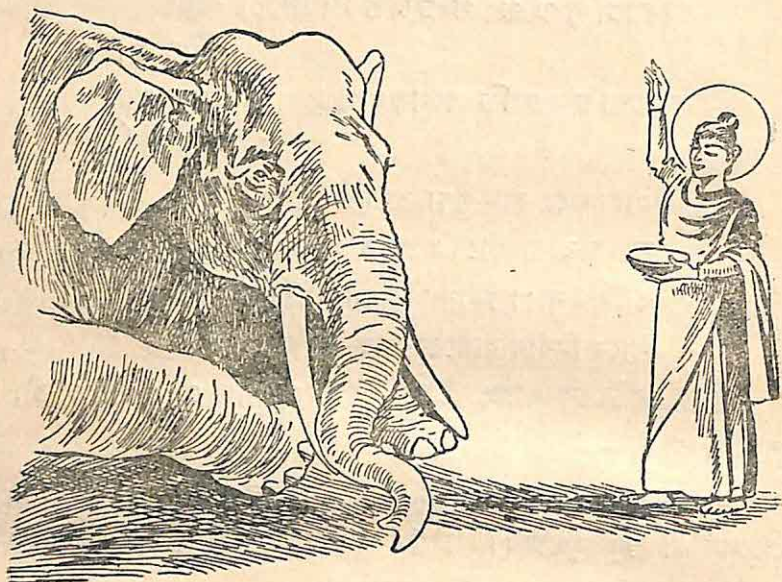
সামনে। দু' পা মুড়ে বসে পড়ল সে পথের ধূলায়। উদ্যত শুঁড় নত হয়ে এল যেন কোন্ এক মায়াবলে।

বুদ্ধদেব ধীরে ধীরে তা'র দিকে এগিয়ে গেলেন। দক্ষিণ হাতটি তুলে আশীর্বাদ করলেন সেই পশু রত্নপালকে।

রত্নপাল ধীরে ধীরে ফিরে গেল আবার বন্দীশালায়।

এবার শুধু আকাশ বাতাশ কাঁপিয়ে নগরবাসীর কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

অপরাহ্নের স্বর্ণ-রবি অস্ত গেল বুদ্ধের মহিমা বিকিরণ করে গোধূলির মেঘে মেঘে।

এরপরে কিছুদিন তিনি রাজগৃহের শালবনে বাস করলেন। একদিন হঠাৎ খবর পেলেন তাঁহার পিতা মহারাজ শুদ্ধোদন আর ইহ জগতে নেই।

নির্বিকারচিত্তে তিনি ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, এই অনিত্য জগতে জন্মগ্রহণ করলেই জীবদেহে জরা মরণের প্রভাব আসবেই। আমার পিতা শুদ্ধোদন পরিণত বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করেছেন। দুর্বলচিত্ত মানুষ শোকে কাতর হয়। কিন্তু একদিক দিয়ে এ শোক নিরর্থক।

এই সময়ে ভিক্ষু উপালি এসে খবর দিলেন, ভগবন্, রাজগৃহের এক দরিদ্রা বৃদ্ধা আপনার দর্শনপ্রার্থিনী।

বুদ্ধদেব তাকে সেখানে আনতে বললেন। বৃদ্ধা লাঠি হাতে ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এসে প্রণাম জানালেন।

—কে তুমি ভদ্রে ?

—এ দাসীর নাম পুণ্যা। প্রভুর বোধ হয় স্মরণ নাই একদিন আমারই হাত থেকে দু'খানি পোড়া রুটি ভিক্ষাপাত্রে কৃপা করে গ্রহণ করেছিলেন। সেইদিন থেকে আমার মন অনুতাপে কাতর হয়ে আছে। ভগবন্, আপনাকে পোড়া রুটি দিয়েছি আমার এ পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নেই।

—পাপ কোথায় পুণ্যা ? তুমি দরিদ্র, তোমার দেওয়া পোড়া রুটি আমার কাছে যে অমৃত! তোমার সেবায় আমি ধন্য।

—ভগবন্, ও কথা ব'লে এ দাসীকে অপরাধিনী করবেন না।

বুদ্ধদেব স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন, বললেন, তুমি এখন কি চাও পুণ্যা ?

—আমাকে কৃপা করে আপনার ভিক্ষুণীদলে গ্রহণ করুন প্রভো।

—বেশ। আনন্দ, পুণ্যাকে প্রব্রজ্যা দান কর।

পুণ্যা প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে ভিক্ষুণী হয়ে বুদ্ধের ও সঙ্ঘের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। আর কালবিলম্ব না ক'রে বুদ্ধদেব এবার কপিলবাস্তু যাত্রা করলেন।

কপিলবাস্তুতে পৌঁছে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম শেষ ক'রে তিনি ফিরলেন নালন্দায়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম তখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতে। একদিকে তক্ষশিলা, অন্যদিকে নালন্দা। আচার্য-উপাচার্যগণ সকলেই বিখ্যাত পণ্ডিত।

সারিপুত্র একদিন এই নালন্দারই অধ্যাপক ছিলেন। বুদ্ধদেব নালন্দায় কয়েকদিন বাস করলেন। দলে দলে পণ্ডিত নানাস্থান থেকে এসে নালন্দার বিদ্যাপীঠে জড় হলেন বুদ্ধদেবের বাণী শোনবার জন্যে। বিশেষতঃ পাগলা হাতীকে বশ করায় ও দস্যু অঙ্গুলিমালকে ভিক্ষুদলে স্থান দেওয়ায় তাঁর মহিমায় সকলেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

নালন্দা থেকে এবার গেলেন শ্রাবস্তীর পথে। সঙ্গে তাঁর ভিক্ষুদল।

কাঁকর-ভরা পাহাড়ে-পথ, বুদ্ধদেব চলেছেন ধীরে ধীরে। দারুণ গ্রীষ্মে পথশ্রমে কাতর, কিন্তু মুখে তাঁর প্রশান্ত ভাব। অচিরবতী নদীটির তটে একটি গাছের ছায়ায় তিনি বসলেন। কিছুদূরে শ্রাবস্তীর গৃহচূড়াগুলি মধ্যাহ্ন-সূর্যের কিরণে নীল আকাশের এক

কোণে ছোট ছোট মেঘের মত দেখা যাচ্ছে। বুদ্ধদেব একদৃষ্টে তারই দিকে চেয়ে আছেন, হঠাৎ গাছটির অপরদিক থেকে অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনে চমকে উঠলেন তিনি।

—কে কাঁদে?

একটি তরুণ যুবক গাছের পাশ থেকে এগিয়ে এলেন তাঁর কাছে। তাকে দেখে পথশ্রমে কাতর বলে বোধ হচ্ছে। নানা গাছের পাতার রসে ও কাঁটায় তা'র উত্তরী ও পরিধেয় ছিন্ন ও মলিন। চোখ তুটি কিন্তু অশ্রুতে টলমল।

—কে তুমি? কাঁদ কেন?—প্রশ্ন করলেন বুদ্ধদেব।

—আমার নাম জীবক, আমি কেমন করে গুরুদেবের কাছে গিয়ে এ মুখ দেখাবো।

—জীবক, কি হয়েছে তোমার?

—ভদন্ত, আমি আয়ুর্বেদ-শিক্ষার্থী। তক্ষশিলায় আয়ুর্বেদাচার্যের কাছে শিক্ষালাভ করেছি। আজ কয়েকদিন হো'ল এদেশে আমার আর এক আচার্যদেব আমাকে বলেছেন, "জীবক, তুমি বারো ক্রোশের মধ্যে এমন একটি গাছ বা লতা নিয়ে এস যার কোন ভৈষজ্য গুণ নেই। যদি আনতে পার, তবেই তোমাকে আয়ুর্বেদের উপাধি দেব, তা না হলে আর আমার গৃহে তোমার স্থান নেই।" আচার্যদেবের কথায় আমি কয়েকদিন থেকে দিবারাত্র ঘুরে ঘুরে বারো ক্রোশের মধ্যে এমন একটি গাছ বা লতা পেলাম না যার কোন ভৈষজ্য গুণ নেই। তাই আর আমার আচার্যদেবের কাছে ফিরে যাবার অধিকার নেই, উপাধিলাভও ভাগ্যে ঘটল না।—জীবকের চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল।

—জীবক!—পরম স্নেহে বুদ্ধদেব জীবককে টেনে নিলেন কাছে।

—ভদন্ত!

—চল, আমি তোমাকে নিয়ে তোমার আচার্যদেবের কাছে যাই, সেখানে তিনি কি বলেন, সেটাও ত তোমার শোনা উচিত।

—এবার নিশ্চয়ই তিনি আমাকে অপদার্থ ভেবে তাঁর শিক্ষাগার থেকে দূর ক'রে দেবেন, এ ছাড়া আর কি হ'তে পারে ভদন্ত?

—চলই-না জীবক, আমি ত তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

বুদ্ধদেব অচিরবতী নদী পার হ'য়ে আয়ুর্বেদাচার্যের শিক্ষাগারে এসে পৌঁছলেন।

অদ্ভুত ধরনের মানুষ এই আচার্য। একটা বড় মাটির ঘরে আসনের উপর উবু হয়ে বসে আছেন তিনি। বাইরে ছাত্রদল নানা কাজে ব্যস্ত। কেউ পড়ছে পুঁথি, কেউ জড় করছে ওষধি।

আচার্যের চুল বড়, অনেকটা জটার মত জড়িয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। পরণে কাষায় বাস। মাথায় রক্তবস্ত্রের পাগড়ী। একটি ছোট নিক্তি নিয়ে কি একটা গাছের শিকড় ওজন করছিলেন। একপাশে কতকগুলি শালপর্ণী ও পৃষ্ণীপর্ণী গাছের পাতা, বৃহতীফল ও দারুহরিদ্রার টুক্‌রা,—আর একদিকে শ্যামালতা, কণ্টকারী, ভার্গী ও ভূনিম্ব। দ্বারের পাশে জড়ো-করা ধাত্রীপুষ্প ও পুত্রঞ্জীবকের ছাল ও পীতবাসকের মূল। কিছু কটুরোহিণী ও শ্বেতবেড়েলা হাতে নিয়ে কি যেন হিসাব করছেন মনে মনে। একটু দূরে পাথরের খলে পীতাভ কি একটা তরল জিনিস রয়েছে, মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে সেটাতে সাদা রংয়ের কি একটা গুঁড়ো মিশিয়ে রংয়ের পরিবর্তন ভাল ক'রে লক্ষ্য করছেন।

—আচার্য!

চমকে চেয়ে দেখলেন আচার্য। বুদ্ধদেবের সামনে এসে বিনীতভাবে দাঁড়ালেন তিনি।

—ভদন্ত, আজ আপনার পদধূলিতে আমার গৃহ পবিত্র হ'ল। আসন গ্রহণ করুন মহাত্মন্।

—আচার্য, আপনার ছাত্র জীবক নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছে, ভৈষজ্য গুণ নেই, এমন কোন গাছ বা লতা সে বারো ক্রোশের মধ্যে কোথাও খুঁজে পায় নি।
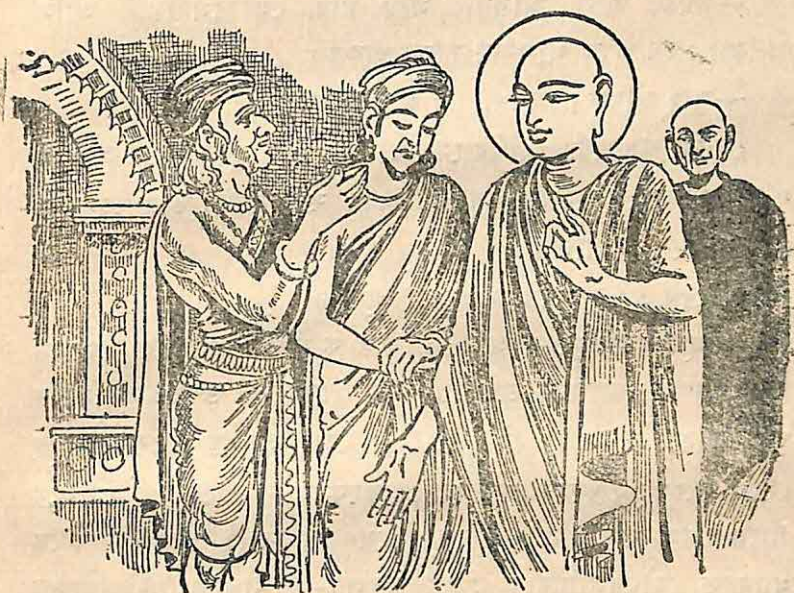
—সে আমি আগেই জানি ভদন্ত, জীবক এমন গাছ পাতা কোথাও খুঁজে পাবে না। আমি শুধু ওকে পরীক্ষা করছিলাম। ওর চেয়ে ধীমান্ ভেষজজ্ঞ আমার ছাত্রদের মধ্যে আর কে আছে!

জীবক এবার লুটিয়ে পড়লেন আচার্যের পদতলে।

অন্য ছাত্রেরাও সব ছুটে এসেছিল ব্যাপার দেখে। সকলের সামনে আচার্য্য নিজের মাথার পাগড়ী খুলে পরিয়ে দিলেন জীবকের মাথায় শ্রেষ্ঠ সম্মানরূপে আচার্যের আশীর্বাদ মুখর হয়ে উঠল ছাত্রদের জয়ধ্বনিতে! আচার্য বললেন—এবার তুমি যেখানে ইচ্ছা গিয়ে চিকিৎসা-বিদ্যা প্রয়োগ করতে পার জীবক, তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

—এবার কোথায় যাবে জীবক?—মৃদু হেসে বললেন বুদ্ধদেব।

—ভদন্ত, আমি আপনার সঙ্গে যাব, লোকসেবায়। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে আপনার সঙ্ঘে থাকব।

—সাধু জীবক! বেশ, এস আমার সঙ্গে।

সেদিন আচার্যের আশীর্বাদের ধারার সঙ্গে বুদ্ধদেবের করুণার ধারা মিশে যে লোকোত্তর প্রতিভার সৃষ্টি করল, তার চিহ্ন রয়ে গেল ইতিহাসের পাতায়।

বুদ্ধদেব এবার ফিরে এলেন রাজগৃহে।

মৌদ্‌গল্যায়ন বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে ঋষিগিরি পাহাড়ে গেলেন কিছুদিনের জন্যে নির্জন তপস্যায়। দেবদত্তের দল তখনও বুদ্ধদেবের অনিষ্টসাধনে বিরত হয় নি। এইবার তারা ষড়্‌যন্ত্র করে রাজগৃহ থেকে কয়েকজন দুর্দান্ত প্রকৃতির লোককে নানা প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গেল ঋষিগিরি পাহাড়ে। সেখানে তারা সুরাপান ক'রে ধ্যানরত মৌদ্‌গল্যায়নকে হত্যা করল। মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন বুদ্ধদেবের দক্ষিণাহস্ত।

বুদ্ধদেবের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, জীবের মৃত্যু একদিন আসবেই, কিন্তু যারা নিষ্পাপ মৌদ্‌গল্যায়নকে হত্যা ক'রে আমার সঙ্ঘের প্রভাব খর্ব করতে চেয়েছে, সে-সব

"মোঘপুরুষদের" সে চেষ্টা কখনও ফলবতী হবে না। আমি মৌদ্গল্যায়নের হত্যার মধ্যে একখানা হিংসা-কুটীল মুখ দেখতে পাচ্ছি, সে মুখ দেবদত্তের। দেবদত্তের কোনদিন মুক্তি নেই, অনন্তকাল সে নরকে থাকবে।

নির্বিকারচিত্তে বুদ্ধদেব মৌদ্গল্যায়নের অভাব সহ্য করে গেলেন। সারিপুত্র ও আনন্দ সর্বদা তাঁর কাছে থাকতে লাগলেন ও ভিক্ষু-সঙ্ঘের ভার নিলেন।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল এইভাবে।

একদিন সকাল বেলায় আনন্দ এসে বুদ্ধদেবকে জানালেন: প্রভো, কপিলবাস্তু থেকে মহাপ্রজাবতী গৌতমী ও যশোধারা গোপা শাক্যবংশীয়া নারীদের সঙ্গে নিয়ে সঙ্ঘে যোগ দিতে এসেছেন।

—কোথায় তাঁরা আনন্দ?

—বহির্দ্বারে অপেক্ষা করছেন, প্রভো।

বুদ্ধদেব দ্রুত গৌতমী, গোপা ও শাক্যবংশীয়া নারীদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাঁদের মাথার কেশ কর্তিত ও অঙ্গে চীবর দেখে বুদ্ধদেব আনন্দকে তাঁদের সকলকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে ভিক্ষুণী-সঙ্ঘে স্থান দিতে আদেশ করলেন।

নন্দ ছিলেন বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ভাই। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী জনপদকল্যাণীর সঙ্গে একদিন তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল, কিন্তু নন্দ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় বিয়ে বন্ধ হয়। একদিন বুদ্ধদেব তাঁকে নিয়ে গেলেন নির্জনে।

—নন্দ, আমি লক্ষ্য করেছি তোমার চিত্ত মাঝেমাঝে উদাস হয়ে পড়ে। সত্য বল, তুমি কি জনপদকল্যাণীকে এখনও ভুলতে পারো নি?

নন্দ বুদ্ধদেবের এ স্নেহস্নিগ্ধ মূর্তি কোনদিন দেখেন নি। ধীরে

ধীরে তাঁর চরণে প্রণাম ক'রে নন্দ বললেন, প্রভো কি আমাকে পরীক্ষা করছেন ?

—না নন্দ, আমি যে তোমার মনের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি জানি, তুমি ধীর, স্থির, প্রশান্ত। ভিক্ষু-সঙ্ঘে তোমার সেবাব্রত অতুলনীয়।

—প্রভুই ত একদিন কপিলবাস্তুতে আমার হাতে আপন ভিক্ষাপাত্র তুলে দিয়েছিলেন।

—হাঁ, তার প্রয়োজন ছিল নন্দ। আচ্ছা, সত্য বল, জনপদ-কল্যাণী কি অসামান্যা সুন্দরী ছিল ?

—প্রভু কি আমাকে আবার পরীক্ষা করবার জন্যে এ কথা বলছেন ?

—না নন্দ, তা নয়। আচ্ছা বেশ, এই নির্জন বনে ঐ বৃক্ষতলে কি দেখছ ?

—একটা মরা বানরী প্রভু। দেখে মনে হয়, কতদিন থেকে ওখানে মরে পড়ে আছে কে জানে ?

—এদিকে দেখ নন্দ, ঐ শালবনের ছায়ায় কে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্য কর।

—এ কি দেখছি প্রভো! এ যে স্বর্গের অপ্সরী!

—হাঁ অপ্সরী। এখন বলত নন্দ, কে বেশী সুন্দরী, জনপদ-কল্যাণী, না, ঐ অপ্সরী।

—নিশ্চয়ই অপ্সরী প্রভু। ওর রূপের কাছে জনপদকল্যাণী ঐ মরা বানরীর তুল্য।

—তা হলে সত্য বল নন্দ, তুমি কাকে চাও,—জনপদকল্যাণীকে, না ঐ অপ্সরীকে ?

—প্রভো, আমার মোহ দূর হয়েছে আপনার কৃপায়। আমি বুঝতে পেরেছি, তৃষ্ণা বেড়েই চলে, তার শেষ নেই। প্রভো, আমায় আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আপনার সদ্ধর্ম্মে অটল থাকি।

—সে আশীর্ব্বাদ আমি ত তোমাকে করেছি নন্দ। আগে ছিলে তুমি যেন ভাঙ্গা-ছাদ ঘর, সেখান দিয়ে পড়ত বাসনা-বৃষ্টির জল, কিন্তু এখন থেকে তুমি হ'লে পাকা-ছাদ ঘর! এবার আর বাসনা-বৃষ্টি পড়বে না।

বুদ্ধদেব মধুর হাসি হেসে উঠলেন। নন্দ তাঁকে প্রণাম করলেন, চোখ বেয়ে জলধারা ঝরে পড়ছিল নন্দর।

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন বুদ্ধদেবের কাছে বৈশালী থেকে কয়েকজন বৃদ্ধ নাগরিক এসে কেঁদে পড়লেন।

—কি হয়েছে আপনাদের?—স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন বুদ্ধদেব।

—ভদন্ত, অনাবৃষ্টিতে বৈশালী নগর মরুভূমির মত হয়ে উঠেছে। শস্যক্ষেত্র শুকিয়ে গেছে, নদীতে জল নেই, জনপদবাসীরা হাহাকার করছে। এখন আপনার কৃপা না হ'লে মড়কে নগর উৎসন্ন হয়ে যাবে। আপনি এ দুর্দিনে আমাদের বাঁচান।

—আমি কি করতে পারি, বলুন আপনারা। বৃথাই আমার কাছে এসেছেন।

—আমরা জানি কত যোগশক্তি আপনার। আপনার পদধূলি পেলে বৈশালী এ ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে।

—প্রকৃতির ওপর মানুষের ত হাত নেই। আর আমার সে শক্তি বা কোথায়? পরোপকার আমার সঙ্ঘের লক্ষ্য। বিপন্ন নরনারীকে সেবা করবার ভার আমি নিতে পারি, তাদের নির্বাণের পথ বলে দিতে পারি, তার বেশী ত আমার শক্তি নেই।

—কেন, আপনার আশীর্বাদ ?

—মানুষের আশীর্বাদে ত ক্ষুধার অন্ন যোগানো যায় না, মেঘ সৃষ্টি ক'রে অনাবৃষ্টি দূর করা যায় না, মড়ক থেকে জনপদবাসীকে বাঁচানো যায় না। চাই ভগবানের আশীর্বাদ। আসুন, সেই আশীর্বাদ আমরা সকলে ভিক্ষা করি।

—সে আশীর্বাদলাভের পথ আপনিই ব'লে দিন।

—আমি আমার সঙ্ঘের ভিক্ষুদলকে সঙ্গে নিয়ে বৈশালীতে যাব, সেখানে তারা করবে আর্তের সেবা, শস্যক্ষেত্রে জলসেচন, ক্ষুধার্তের জন্য অন্নসংগ্রহ।

—চলুন প্রভো, আপনার পদধূলিতে বৈশালী ধন্য হোক্ ?

বুদ্ধদেব সকলকে নিয়ে চললেন বৈশালীর দিকে। নদীতে জল ছিল না, পার হ'তে কোন কষ্ট হ'ল না। বৈশালীর শুষ্ক মাঠের উপর দিয়ে তাঁরা চললেন নগরের দিকে। যতদূর দৃষ্টি চলে ধূ ধূ করছে প্রান্তর। হঠাৎ তামার মত ঝকঝকে আকাশের এক কোণে দেখা দিল একখণ্ড কালো মেঘ।

সকলের চোখ সেইদিকে পড়ল। সে-মেঘ বাড়তে বাড়তে আকাশ ছেয়ে ফেলল। উঠল ঝড়। আরম্ভ হ'ল বৃষ্টি। সে বৃষ্টিধারা পান ক'রে ধরণী আবার শীতল হ'ল। নদী ভ'রে উঠল কানায় কানায়। সাতদিনের বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল মড়কের বীজ। শস্যে হেসে উঠল বৈশালীর মাঠ।

লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল বুদ্ধদেবের মহিমা। বৈশালীর লিচ্ছবিরা তাঁকে মহাসমাদরে নিয়ে গেলেন মহাবনে। আর তাঁর পদপ্রান্তে প'ড়ে তাঁর মহিমাকীর্তন করলেন।

বুদ্ধদেব শুধু বললেন, তোমরা বৃথাই আমার গুণগান

করছ। যাঁর কানে আর্তের ক্রন্দন পোঁছেছে, তিনিই এ ব্যবস্থা করেছেন।

বৈশালীর জলভরা নদী, শস্যভরা মাঠ, মানুষের হাসিভরা মুখ জানিয়ে দিল, আর্তের কাতর আহ্বানে ভগবান সাড়া দিয়েছেন।

এবার বুদ্ধদেব চললেন রাজগৃহের পথে। দীর্ঘপথ, কোথাও ছায়াময়, কোথাও ছায়াহীন। কোথাও সরল, কোথাও উঁচু-নীচ। তিনি চলেছেন ধীরে ধীরে। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন, খানিক দূরে আগে আগে কে একজন চলেছে তাঁর সামনের রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতে, পথের কণ্টক সরাতে সরাতে।

তিনি আনন্দকে ডেকে বললেন, দেখত আনন্দ, ঐ দূরে আমার চলার পথ ঝাঁট দিতে দিতে কে চলেছে। যতটা পথ আমি চলেছি, সেও লক্ষ্য রেখে না থেমে একাগ্রভাবে ঝাঁট দিয়ে গেছে।

অনন্দ দৌড়ে গিয়ে লোকটাকে ডেকে আনলে। বুদ্ধদেব একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলেন, তাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে ? আমার পথ এমন ক'রে পরিষ্কার ক'রে চলেছ কেন বলত ?

—প্রভু, আমি অতি নীচ জাতি, নাম আমার স্থনীত। ঝাড়ু-দারের কাজই আমার কাজ। ভাবলাম, আপনার পায়ের ধূলা যদি এ পথে পড়ে, তাহ'লে কাঁটা ও কাঁকর সরিয়ে পথ ত পরিষ্কার রাখা চাই। তাই আমি আপনার চলার পথ ঝাঁট দিতে দিতে চলেছি।

শান্তস্বরে বুদ্ধদেব বললেন, তুমি অতদূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন, কাছে এস স্থনীত।

—প্রভো, আমি অস্পৃশ্য, আপনার কাছে যাবার অধিকার নেই আমার।

বুদ্ধদেব মৃত্যু হাসলেন। এ যেন অনন্তবিস্তার মহাসমুদ্রের উপর

এক ঝলক স্নিগ্ধ চাঁদের আলো মেঘের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ল। বুদ্ধদেব বললেন ঃ তুমি আমার কাছে কি চাও সুনীত ?

—প্রভো, আপনার কৃপা।

—এস, ভিক্ষু সুনীত, এস।

—আপনি আমাকে ভিক্ষু ব'লে ডাকলেন প্রভো ?

—আমি ত তোমাকে ভিক্ষুসঙ্ঘে নিলাম সুনীত। তুমি তোমার সেবাধর্মে অনেক উপরে উঠে গেছ। আনন্দ, তুমি সুনীতের প্রব্রজ্যা গ্রহণের আয়োজন কর।

সুনীত ভিক্ষু হলেন। ফিরে এসে জেতবনের নির্জন পরিবেশে বুদ্ধদেব বসলেন এবার ধ্যানে।

আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁর একটু দর্শনের জন্য পাগল, তাঁর কথা শুনলে পরম তৃপ্তিলাভ করে, কেউ কেউ আবার সংসার ছেড়ে তাঁর ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগ দেয়,—এতে দু'চার জন অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মনেতার গাত্রদাহ হ'ল। তাঁরা স্থির করলেন, যেমন করে হোক্ বুদ্ধদেবের প্রভাব খর্ব করতেই হবে। লোকচক্ষে বুদ্ধদেবের খ্যাতি-প্রতিপত্তি যাতে ম্লান হয়ে যায়, এবার তাঁরা সে ষড়্‌যন্ত্র করলেন।

রূপ-বিলাসিনী চিঞ্চাকে তাঁরা অর্থলোভে বশীভূত ক'রে একদিন সন্ধ্যায় পাঠালেন জেতবনে বুদ্ধের কাছে ধর্মতত্ত্ব শুনতে।

বুদ্ধদেব তখন বসেছিলেন একটি শালগাছের নীচে। পূবদিকে সবে চাঁদ উঠেছে। বাতাসে শালফুলের মিষ্টিগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের ত্রিশরণমন্ত্রগান এইমাত্র থেমেছে। অদূরে সঙ্ঘের বিহারে ও কুটীতে, নানাস্থানে একে-একে প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। এইমাত্র ভিক্ষু কাত্যায়ন ও ভিক্ষু নাগসেন বুদ্ধদেবের সামনের

ধূপাধারে চন্দনচূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন। আনন্দও সারিপুত্র নগরে ভিক্ষায় গেছেন, তখনও ফেরেন নি। জীবক গেছেন সাকেত নগরের এক শ্রেষ্ঠীপত্নীর চিকিৎসা করতে। কাশ্যপ আছেন সঙ্ঘের চীবর-সংগ্রহের কাজে।

এদিকে কৌশাম্বী নগর থেকে রাজা উদয়ন বুদ্ধদেবের সদ্ধর্ম গ্রহণ করতে শীঘ্র এসে পড়বেন—একথা তাঁর কানে পৌঁছেছে। ভোগনগর ও অবলম্বিকা গ্রামের বহু পণ্ডিতব্যক্তি আসছেন এবার তাঁর ধর্মব্যাখ্যা শুনতে।

এই শান্ত সন্ধ্যার পবিত্র পরিবেশে বুদ্ধদেব কতকটা ধ্যানস্থ হয়ে এই সব কথা ভাবছিলেন, হঠাৎ মঞ্জীর-কাঁকনের শব্দে তাঁর ধ্যান ভাঙ্গল।

অস্ফুট চন্দ্রালোকে অপরূপ সুন্দর বিলাসিনী চিঞ্চা এসে প্রণাম জানালেন বুদ্ধ-চরণে।

—প্রভো, আমি এসেছি আপনার চরণ-দর্শনে। আপনার মুখ থেকে আমার কয়েকটি জটিল প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করি। বুদ্ধদেব মৃদু হাসলেন। যাঁরা ধর্মতত্ত্ব শুনতে আসেন, সে-সব নারীর ত এ রকম বেশভূষা হয় না। আর তা'ছাড়া এ সময়েও তাঁরা আসেন না। তিনি যেন চিঞ্চার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পেলেন, গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তুমি ফিরে যাও ভদ্রে।

—কেন প্রভো?

—কি মন নিয়ে তুমি এখানে এসেছ জান?

চমকে উঠলেন চিঞ্চা। তাঁর অন্তর কেঁপে উঠল অজানা ভয়ে। তবু সাহস সঞ্চয় করে বললেন চিঞ্চা, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মন কি আপনার কৃপালাভে বঞ্চিত হবে প্রভো?

এবার স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন বুদ্ধদেব, বললেন, যাঁরা তত্ত্বকথা শুনতে আসেন, তাঁরা আসেন দীনবেশে। তোমার চোখে কাজলের রেখা কেন চিঞ্চা? কবরীতে ফুলের মালা কেন? অধরে তাম্বুল-রাগ কেন? বহুমূল্য সূক্ষ্ম বসনে অঙ্গের লাবণ্য দেখাবার

ছল কেন? চিঞ্চা, তোমার হাসিতে, তোমার মঞ্জীর-কাঁকনের ধ্বনিতে আমার সব তত্ত্বকথা কোথায় হারিয়ে ফেলবে তুমি, তা কি জান না? ফিরে যাও কন্যে, এ জেতবন তোমার জন্য নয়।

—প্রভো, সত্যই কি আমাকে অপরাধিনী করলেন?

—অপরাধ তোমার একার নয় চিঞ্চা, যারা তোমাকে প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে আমার নামে, সঙ্ঘের নামে কলঙ্ক দিতে পাঠিয়েছে, তুমি কি ভাব তাদের পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না?

আবার ভয়ে কেঁপে উঠল চিঞ্চার মন।

বুদ্ধদেব বলতে লাগলেন, একদিন হারিয়ে যাবে কালস্রোতে তোমার এ রূপ-যৌবন, মরণের দ্বারে এসে জীবনের সকল পাপ, সকল অপরাধ তোমারই জন্যে গড়ে তুলবে সীমাহীন বেদনার পথ। চিঞ্চা, সেদিন অনন্ত নরকের সে অন্ধকার পারবে সহ্য করতে?

—প্রভো, ক্ষমা করুন আমাকে!—লুটিয়ে পড়লেন চিঞ্চা বুদ্ধের চরণতলে।

তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন চিঞ্চা। ছিঁড়ে ফেললেন তাঁ'র পুষ্পমালা, খুলে ফেললেন তাঁর রত্ন-আভরণ। অশ্রুভরা-চোখে বুদ্ধদেবের চরণে প্রণাম জানিয়ে তিনি ছুটে গেলেন ভীতা হরিণীর মত জেতবনের বাইরে, অন্ধকার রাজপথে।

বুদ্ধদেব এবার হাসলেন, সে হাসি আকাশের জ্যোৎস্নার মতই স্নিগ্ধ, সুন্দর। মনে পড়ল তাঁর অতীত দিনের একটি ছবি। তখন তিনি বুদ্ধত্বলাভ করে কাশীর সারনাথে প্রথম গেছেন ধর্মচক্র প্রবর্তনে।

বরুণা ও অসি যেখানে এসে মিলেছে তার কাছেই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল কাশীর রাজকন্যার। তিনি সেখানে তাঁর শিষ্যদের কাছে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। চঞ্চলা কিশোরী মেয়েটি, চোখেমুখে অপূর্ব সরলতা, সঙ্গিনীদের সঙ্গে সেদিনও স্নান করতে এসেছিল কি এক উৎসবে।

—তুমি বুঝি সন্ন্যাসী?

—বুদ্ধদেব স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলেন—হাঁ মা, আমি সন্ন্যাসী।

—মাথা মুড়ুলে আর হলদে কাপড় পরলেই বুঝি সন্ন্যাসী হওয়া যায়?

—না মা, ওটা বাইরের আবরণ। বৈরাগ্যই হাল সন্ন্যাসীর আসল বেশ।

—আচ্ছা, ভিক্ষে কর কেন?

—ভিক্ষাই যে আমার ধর্ম।

—অমন ক'রে পাগলের মত কি-সব কথা বল, যার মানে বোঝা যায় না?

বুদ্ধদেব বললেন, যে দিন ওর মানে বুঝবে, তোমার সে শুভদিন আসুক কন্যে। বৈরাগ্যের পথই যে শান্তির পথ, পরোপকার ও মৈত্রীই যে পরম ধর্ম।

সঙ্গিনীরা হেসে উঠল, বলল, চলে এস রাজকন্যা, পাগলের সঙ্গে কথা বলে কি হবে?

রাজকন্যাও হেসেছিল, বুদ্ধদেবকে উপহাস করে বলেছিল, আমার বাবা কাশীরাজের পাগলের জন্যে কারাগার আছে, যাবে তুমি সেখানে?

বুদ্ধদেব স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন, বেশ ত, তোমার বাবা যদি আমার কথা শুনে আমাকে পাগল বলেই ভাবেন, তা'হলে না হয় কারাগারেই যাওয়া যাবে।

রাজকন্যা এবার বুদ্ধদেবের সামনে এসে দাঁড়াল, বলল, আচ্ছা, আমি যে তোমাকে এতগুলো শক্ত শক্ত কথা বললাম, তোমার রাগ হ'ল না?

বুদ্ধদেব বললেন, রাগ হবে কেন কন্যে?

অক্রোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিষং দানেন সচ্চেনালিকবাদিনং॥

অক্রোধে তুমি জয় কর ক্রোধ, সাধুতায় কর অসাধুতায়,
দারিদ্র্য জয় কর তব দানে, মিথ্যাবাদীরে সৎ-কথায়।

সঙ্গিনীরা হেসে উঠল, রাজকন্যা কিন্তু এবার যোগ দিল না তাদের সঙ্গে। তারপর তারা সকলে চলে গেল রাজপ্রাসাদে।

সেদিন সন্ধ্যায় পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছিল গঙ্গার ওপারে। উৎসবের দীপমালা সাজিয়ে কাশীর নরনারী গান গেয়ে গেয়ে এসেছিল তীর্থবারি নিতে। সারনাথের আশ্রমদ্বারে পড়ল দুটি ছায়া।

কাশীর রাজা স্বয়ং এসেছেন বুদ্ধদেবের কাছে, সঙ্গে তাঁর কন্যা।

অনেক কথা হ'ল রাজার বুদ্ধদেবের সঙ্গে। কিশোরীর চোখে সেদিন আশ্রমের ক্ষীণ দীপালোকে যে দু'ফোঁটা অশ্রু টলমল করে উঠেছিল তারই কল্যাণ-স্পর্শে সেদিন হ'ল এক শুভদিন। বুদ্ধদেবের ধর্ম গ্রহণ করলেন কাশীরাজ। সারনাথে মেয়েদের জন্যে গড়ে উঠল ধর্ম-বিদ্যালয়। রাজকন্যা নিজেকে নিঃশেষ ক'রে বিলিয়ে দিলেন বুদ্ধদেবের চরণে, জগতের কল্যাণে।

বুদ্ধদেব সারনাথ থেকে চ'লে এসেছেন আজ অনেকদিন, কিন্তু এখনও সেই মুণ্ডিতকেশা, কাষায়-বসনা, সর্বরিক্তা সন্নাসিনীর মাতৃমূর্তি মনে পড়ে তাঁর।

এইবার বুদ্ধদেব পুনরায় ধর্মপ্রচার করবার জন্যে জেতবন ছেড়ে নানাস্থানে ভ্রমণ আরম্ভ করলেন। রাজগৃহ থেকে সারিপুত্র ও আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে তিনি অবলম্বিকা গ্রামে গেলেন, সেখান থেকে নালন্দায়। নালন্দায় সারিপুত্রকে ধর্মোপদেশদানের জন্যে রেখে তিনি কোটীগ্রাম ও নাদিকাগ্রামের বিহারে গেলেন। বৈশালী থেকেও নগরবাসীরা তাঁকে আহ্বান করেছিলেন কূটগার বিহারে। সেখান থেকে গেলেন ভোগনগরের আনন্দ-চৈত্যে।

এই সময়ে তিনি সংবাদ পেলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য সারিপুত্র আর ইহজগতে নেই। নালন্দায় সারিপুত্র কঠোর পরিশ্রমে ব্যাধিগ্রস্ত হন ও সেই ব্যাধিই তাঁর কাল হ'ল। সারিপুত্রের ভাই তাঁর ভিক্ষাপাত্র ও চীবর নিয়ে বুদ্ধদেবের চরণে অর্পণ করলেন। বুদ্ধদেব ধীরে ধীরে বললেন, সারিপুত্রের মত খুব কম লোকই জগতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

বুদ্ধদেবের বয়স তখন প্রায় আশীর কাছাকাছি। নানাস্থানে ঘুরে বেড়াবার শারীরিক শক্তিও কমে এসেছে তাঁর। তিনি এবার ধীরে ধীরে বিল্বগ্রামের দিকে গেলেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান ক'রে আবার বৈশালীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

যে অদম্য মানসিক শক্তি তাঁর প্রায় আশীবৎসরের শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে মানসিক শক্তি অটুট থাকলেও নানাকারণে শরীরে যেন আর সে শক্তি ছিল না। মৌদ্‌গল্যায়ন ও সারিপুত্রের পরে কালবশে অনাথপিণ্ডদও পরলোকগমন করলেন। মহাপ্রজাবতী গৌতমী ও রাহুলমাতা গোপাও একে একে ইহধাম থেকে বিদায় নিলেন। শেষে রাহুলও একদিন তাঁদের পথেই এ জগতের সকল বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করলেন।

নির্বিকার বুদ্ধদেব সমস্ত শুনলেন। আনন্দকে ডেকে বললেন,—আনন্দ, সংসারে সমস্তই অলীক, সত্য শুধু সদ্ধর্ম। আমার ধর্মসম্বন্ধে প্রায় সব কথাই তোমাদের বলেছি। এ সংসার-সাগরে আমার সদ্ধর্মের সাহায্যে তোমরা দ্বীপ রচনা কর।

দূরে বৈশালীর গৃহচূড়াগুলি ছবির মত দেখা যাচ্ছে, এই বৈশালীকে ঘিরে তাঁর ধর্মপ্রচারের কাজ সাফল্য লাভ করেছিল। এবার বৈশালী ছেড়ে তিনি এগিয়ে চললেন পাবাগ্রামের দিকে।

পাবাগ্রামের একটি সুন্দর আমবাগান তাঁর থাকবার জন্যে নির্দিষ্ট হ'ল। যাঁর এই আমবাগান তাঁর নাম ছিল চুন্দ। তিনি বুদ্ধদেবের সামনে এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়ালেন, বললেন, প্রভো যখন এ দীনের আমবাগানে পদার্পণ ক'রছেন তখন এ দীনের গৃহে কিছু আহার ক'রে তাকে ধন্য করুন।

বুদ্ধদেব চুন্দের আগ্রহ দেখে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তখনকার দিনে আলুর মত একরকম বড় আকারের আলু মাটির নীচে জন্মাত। সেগুলির গায়ে কালো কালো লোমের মত শিকড় থাকত, আর দেখতেও অনেকটা জন্তুর চেহারার মত। শূকরের লোমের মত কালো কালো শিকড় থাকাতে চলিত কথায় সে আলুকে বলা হ'ত "শূকর মদ্দব"। এই আলু খেতে খুব ভাল, কিন্তু গুরুপাক। চুন্দ আগ্রহভরে বুদ্ধদেবের জন্যে এই আলু শূল্যপক্ক করে, অতি উপাদেহ খাদ্য রাঁধলেন।

কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। সেই খাদ্য খেয়ে বুদ্ধদেবের দেখা দিল রক্ত আমাশয়। শরীরে দারুণ যন্ত্রণা হাসিমুখে সহ্য ক'রে তিনি এবার ধীরে ধীরে চললেন কুশীনগরের দিকে। রোগ কিন্তু বেড়েই গেল।

মাঝখানে হিরণ্যবতী নদী। কোনক্রমে সে নদী পার হয়ে তিনি আর চলতে পারলেন না। কাছেই ছিল একটা শালবন। সেই শালবনে একটা বড় শালগাছের নীচে তিনি আনন্দকে তাঁর শেষ-শয্যা রচনা করতে বললেন। ভিক্ষুগণ দলে দলে এসে সকলে এবার তাঁর চারপাশে বসলেন। তিনি তাঁদের শেষ উপদেশ দিতে লাগলেন। ভিক্ষু কাশ্যপকে ডেকে সঙ্ঘের ভার তাঁর ওপরেই দিলেন আর তাঁর সঙ্গে নিজের বস্ত্র বিনিময় করলেন।

আনন্দ প্রশ্ন করলেন : প্রভো, সত্যি কি এবার আমাদের ছেড়ে যাবেন ?

বুদ্ধদেব বললেন :

পরিপক্কো বয়ো মযহং পরিত্তং মম জীবিতং।
পহায় বোগমিস্সামি কত্তং মে সরণমত্তনো॥
অপ্পমত্তা সতিমন্তো সুসীলা হোথ ভিক্খবো।
সুসমাহিত-সংকপ্পা সচিত্তম্ অনুরক্খথ॥
যো ইমস্মিং ধর্ম্মবিনয়ে অপ্পমত্তো বিহেস্সতি।
পহায় জাতিসংসারং দুক্খস্সন্তং করিস্সতি॥

হ'ল পরিণত বয়স আমার, জীবনের আছে অল্প বাকী,
সব ত্যাগ ক'রে চলে যাব আমি শেষ-আশ্রয় লক্ষ্য রাখি'।
তোমরা ভিক্ষু হ'য় না মত্ত, হও সমাহিত, সুশীল হও,
চিত্তের পানে ফিরাও নয়ন, আপন লক্ষ্যে অটল রও।
প্রমোদ-বিহীন চিত্ত লইয়া ধর্মের মাঝে বিহার কর,
না লভি জনম, সংসার-জ্বালা,—দুঃখধ্বংসী এ পথ ধর।

আনন্দ প্রশ্ন করলেন, প্রভো, এই জগৎ অনন্ত না শান্ত, সসীম না অসীম, দেহ ও প্রাণের মধ্যে একত্ব আছে, না, ভিন্নত্ব আছে, মৃত্যুর পরেও মানুষের অস্তিত্ব থাকে কিনা।

বুদ্ধদেব বললেন, একদিন এইসব প্রশ্নের উত্তরে আমি ভিক্ষু মালুঙ্ক্যপুত্রকে যা কিছু বলেছি সেই কথাই আবার বলছি। জরা-ব্যাধি-মরণভয়ে কাতর জীব তার পরিত্রাণের উপায়-নির্ধারণের চেষ্টা না ক'রে এসব নিরর্থক প্রশ্নে কেন সময়-ক্ষেপ করবে? কোন লোক যদি বিষাক্ত বাণদ্বারা আহত হয় তাহলে

সেই বিষাক্ত বাণের বহিষ্কার বা কোন চিকিৎসা না ক'রে তিনি যদি বলেন, আগে জানতে চাই, যে বাণ মেরেছে সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র? স্ত্রী কি পুরুষ? বেঁটে কি লম্বা? সে-তীরটা কোন্ কামার তৈরী করেছে?—এসব উত্তর না পেলে আমি আমার দেহ থেকে বিষাক্ত বাণ বার করতে দেব না।—তাহলে সেই আহত লোকটির কি অবস্থা হবে? সে মরবে নিশ্চয়। এও তাই। বড় বড় দর্শন-তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন করে লাভ কি? দুঃখ-তীর-বেঁধা মানুষকে দুঃখ-মুক্ত করাই প্রথম ও প্রধান কাজ।

আনন্দ বললেন, প্রভো, দুঃখ থেকে মুক্ত হবার উপায় কি বৈরাগ্য?

বুদ্ধদেব বললেন, বৈরাগ্য অতি কঠিন পথ, আনন্দ। সর্ববিষয়ে আসক্তিহীনতাই বৈরাগ্য।

“যে রাগরত্তানুপতন্তি সোতং
সয়ং কতং মক্কটকো ব জালং।
এতম্পি ছেত্বান বজন্তি ধীরা
অনপেখিনো সব্বদুক্খং পহায় ॥”

ঊর্ণনাভ নিজ জালে ঘুরিয়া ফিরিয়া
যথা করে বিচরণ, যায় না সরিয়া,
রাগাসক্ত নর ফেরে তেমনি সংসারে,
বৈরাগ্য পেলেই জাল ছেড়ে যেতে পারে।

আনন্দ বললেন, প্রভো, মানুষের মনে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে ভয় উপস্থিত হয়। এর কারণ কি, আর উদ্ধারের উপায়ই বা কি?

বুদ্ধদেব বললেন ঃ

"পেমতো জায়তী সোকো পেমতো জায়তী ভয়ং।
পেমতো বিপ্‌পমুত্তস্‌স নৎথি সোকো কুতো ভয়ং ॥"

মায়া থেকে জন্মে হেথা যাহা কিছু শোক,
মায়া থেকে জন্মে ভয় যাহা কিছু হ'ক।
মায়া থেকে মুক্ত যিনি কোথা শোক তাঁর,
স্পর্শ না করিবে তাঁরে কোনো ভয় আর।

এই সময়ে একজন ভিক্ষু এসে আনন্দকে জানালেন সুভদ্র নামে এক পরিব্রাজক বুদ্ধদেবকে দর্শন করিতে চান।

আনন্দ একথা বুদ্ধদেবকে জানালে তিনি সুভদ্রকে তাঁর কাছে আসতে বললেন।

সুভদ্র এসে বুদ্ধদেবকে প্রণাম ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—তোমার প্রার্থনা কি সুভদ্র?

—আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ।

বুদ্ধদেব হাসলেন, বললেন, আর ত সময় নেই। এবার আমার এই দেহের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। আর আমার শেষ বিদায়ের লগ্নও নিকটে এসেছে। তবু আমি তোমার আশা পূর্ণ করব। কাছে এস সুভদ্র।

সুভদ্র কাছে আসতেই বুদ্ধদেব তাকে প্রব্রজ্যা দান করলেন। সুভদ্রই তাঁর শেষ সাক্ষাৎ-শিষ্য।

তারপর বুদ্ধদেব ধীরে ধীরে ধ্যানস্থ হলেন। সেই ধ্যানে তাঁর মুখমণ্ডল ও দেহ উজ্জল হয়ে উঠল। একান্ন বৎসর পূর্বে যে নির্বাণ-

লাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি একদিন গৃহত্যাগ করেছিলেন আজ সেই মহা-নির্বাণ তিনি লাভ করলেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় শালগাছের নীচে একদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আজ বৈশাখী পূর্ণিমায় কুশীনগরের শালগাছের নীচেই তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেবের মহা-পরিনির্বাণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ভারতে। চারদিক থেকে দলে দলে শিষ্যমণ্ডলী,
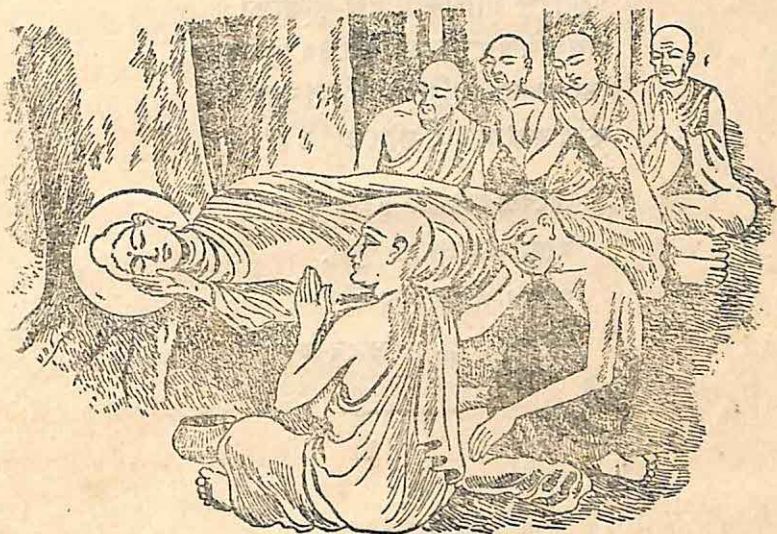
রাজমণ্ডলী, ভক্তমণ্ডলী এসে সমবেত হলেন তাঁর দেহ পার্শ্বে। নূতন বসনে আচ্ছাদিত ক'রে চন্দন কাষ্ঠের চিতায় তাঁর নশ্বর দেহ মুকুটবন্ধন নামক চৈত্যে ভস্মীভূত হ'ল। তারপর তাঁর দেহ-ভস্ম ও অস্থি নিয়ে দেশে দেশে অসংখ্য স্তূপ, চৈত্য, বিহার, কুটী গড়ে উঠল। তাঁর দন্তের উপরে সিংহলে এক অপরূপ চৈত্য নির্মাণ করা হ'ল।

ভারতে দশটি প্রধান স্তূপ আজও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বুদ্ধের মহিমা প্রচার করছে। তারমধ্যে আটটি শরীর-স্তূপ, একটি কুম্ভ-স্তূপ ও একটি আঙ্গার-স্তূপ। কলসীর মধ্যে তাঁর নশ্বর দেহভস্ম রাখা হয়েছিল সে কুম্ভের উপরেই ছিল এই কুম্ভ-স্তূপ।

আজ আড়াই হাজার বছর পরেও আমরা বুদ্ধদেবকে বন্দনা করি—

"দেবিন্দ নাগিন্দ নরিন্দ পূজিতো
মনুস্‌সিন্দ-সেট্‌ঠেহি তথেব পূজিতো।
তং বন্দথ পঞ্জলিকা ভবিত্বা বুদ্ধে
হবে কপ্পসতেহি দুল্লভো তি॥"

দেবেন্দ্র-নাগেন্দ্র-নরেন্দ্র পূজ্য,
মনুষ্যশ্রেষ্ঠ-সুধীন্দ্র-পূজ্য,
কৃতাঞ্জলিবদ্ধে বন্দ শ্রীবুদ্ধে,
শতেক কল্পে দুর্লভ যে-জন্ম।